ইউনিট ৪

সমসাময়িক মতবাদ
Comtemporary Management

ভূমিকা

ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বহু চড়াই-উতরাই পাড়ি দিয়ে আজকের একুশ শতকের ব্যবস্থাপনা এ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। তবে বিশ শতকে ব্যবস্থাপনার সত্যিকার উন্নয়ন সাধিত হয়। মানুষ পারিবারিকভাবে বসবাসের পূর্বেই ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। মূলত কৃষি কাজের মধ্য দিয়ে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করে। আর তখন থেকেই মূলত ব্যবস্থাপনার যাত্রা শুরু। বিভিন্ন সভ্যতা এ যুগে ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে অবদান রাখে। মধ্যযুগে ব্যবস্থাপনার তেমন উন্নয়ন হয়নি। এ সময় সামন্ত প্রথা চালু ছিল। তবুও এ সময় ব্যবস্থাপনার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়। শিল্পবিপ্লবের সময় ব্যবস্থাপনার অনেক উন্নয়ন হয়। কারণ এ সময় শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। এগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন ছিল। এ সময় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনারও সূত্রপাত হয়েছিল। এউপর আসে পদ্ধতিগত ব্যবস্থাপনার যুগ যা ১৯০০ শতক থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত। এ সময় ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে উন্নয়ন সাধিত হয়, তা-ই সমসাময়িক ব্যবস্থাপনা (Comtemporary Management)। আলোচিত ইউনিটে সমসাময়িক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়:	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ-৪.১:	আধুনিক মতবাদ; আধুনিক ব্যবস্থাপনার মৌলিক ধারণা; বৈশিষ্ট্য ও এর বিভিন্ন দিক; ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বের তত্ত্বসমূহ; নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য তত্ত্ব
পাঠ-৪.২:	নেতৃত্বের আচরণ তত্ত্ব; নেতৃত্বের পরিস্থিতি তত্ত্ব
পাঠ-৪.৩:	উৎকর্ষ আরোপন মতবাদ; সামাজিক ব্যবস্থা মতবাদ; অভিজ্ঞতাভিত্তিক মতবাদ; ব্যবস্থাপনা ভূমিকা মতবাদ, সিদ্ধান্ত মতবাদ; পুন:প্রকৌশল মতবাদ,
পাঠ-৪.৪:	সংখ্যাত্মক মতবাদ; সিস্টেম মতবাদ
পাঠ-৪.৫:	সাপেক্ষ তত্ত্ব; ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব জঙ্গল

পাঠ-৪.১ আধুনিক মতবাদ; আধনিক ব্যবস্থাপনার মৌলিক ধারণা; বৈশিষ্ট্য ও এর বিভিন্ন দিক; ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বের তত্ত্বসমূহ: নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য তত্ত্ব

Modern School; Key Concepts of the Modern Theory of Management, Characteristics of Modern Theory of Management; Theories or Approaches of Leadership; Trait approach of leadership

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আধুনিক মতবাদ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- আধুনিক ব্যবস্থাপনার মৌলিক ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

আধুনিক মতবাদ

Modern School

আধুনিক (Modern) শব্দটি দ্বিধান্বিত। কারণ, পরিস্থিতি সব সময় পরিবর্তনশীল এবং আজ যা আধুনিক, কাল তা পুরাতন, অকেজো এবং বর্জনীয়। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এফ. ডব্লিউ. টেলরের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ও হেনরি ফেয়লের ব্যবস্থাপনার সার্বজনীন নীতিমালা দিয়ে আধুনিকতা শুরু হয়েছে। কিন্তু এগুলো ব্যবস্থাপনার প্রাচীন ধারণা। আধুনিক বলতে অতি সাম্প্রতিক বুঝায়। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আধুনিক বলতে বুঝায় বহুমুখী শৃঙ্খলা, বহু স্তরীয় এবং বহুমুখী ধারাকে বুঝায়। সাধারণত ব্যবস্থাপনার ৫২ বছরের কার্যক্রমকে আধুনিক ব্যবস্থাপনা বলে অভিহিত করা হয়। Chester I Bernard ১৯৩৮ সালে তার বিখ্যাত বই "The function of executive" প্রকাশ করেন, যা আধুনিক ব্যবস্থাপনার দিকপাল। তবে এ ব্যবস্থাপনার ভিত্তি হলেন এফ. ডব্লিউ টেলর। এ মতবাদ বহু জ্ঞানী-গুণীদের গবেষণা ও অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন Professor P.M.S Blackell, H. A. Simon, M. G. Kendall, J. Von Neumann, C. Shannon, F. W. Harris, W. Leontiff, L. V. Kan toro vich R, A. Fisher, C. J. Thomam, F. E. Zimmerman, D. Katz, R. L. Khan Joan Woodward, Paul Lawrence James D. Thompson প্রমুখ।

ব্যবস্থাপনা আধুনিক তত্ত্বের মৌলিক ধারণা

Key Concepts of the Modern Theory of Management

ব্যবস্থাপনার আধুনিক তত্ত্ব বা মতবাদ মৌলিক কতকগুলো ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়। নিম্নে ব্যবস্থাপনার আধুনিক তত্ত্বের মৌলিক ধারণাগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

১. **আনুষ্ঠানিক সংগঠন (Formal Organization):** আনুষ্ঠানিক সংগঠন ব্যবস্থাপনার আধুনিক মতবাদের এমন মৌলিক উপাদান, যেখানে প্রত্যেক কর্মী ও ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্ধারিত থাকে। এতে কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে একে অপরের উপর নির্ভরশীলতা পরিমাপ করা যায়।

২. **ভৌত পরিবেশ (Elemental Environment):** ভৌত পরিবেশ বলতে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ অবকাঠামোকে বুঝায়। যেমন: দালানকোঠা, মেশিনারিজ স্থাপন, অফিস বিন্যাস, শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা প্রভৃতি। ভৌত পরিবেশ ব্যবস্থাপনার আধুনিক মতবাদের অন্যতম মৌলিক উপাদান। যেখানে সংগঠনের উদ্দেশ্য অর্জনের যাবতীয় ইতিবাচক ভৌত পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি সম্পাদনে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৩. **সমন্বয় (Co-ordination):** সমন্বয় আধুনিক তত্ত্বের অন্যতম মৌলিক উপাদান যা ব্যবস্থাপনার মানবীয় ও বস্তুবাচক সম্পদের সঠিক সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথ সুগম করে।

৪. **ব্যক্তি (Person):** ব্যক্তি আধুনিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম মৌলিক উপাদান। যেখানে ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও সাংগঠনিক উৎপাদনশীলতা অনেকাংশে ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল।

৫. **প্রক্রিয়া (Process):** প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনার আধুনিক মতবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এতে সাংগঠনিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একাধিক বিকল্প প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে উত্তম প্রক্রিয়া ব্যবহার সম্ভব।

৬. **সহযোগিতা (Co-operation):** লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কর্মী এবং দলগুলোর মধ্যে সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। সহযোগিতার মাধ্যমে কার্যসম্পাদন অব্যাহত থাকে।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, আধুনিক মতবাদে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য উপর্যুক্ত মৌলিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের পথ সুগম করে।

ব্যবস্থাপনার আধুনিক তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Modern Theory of Management

আধুনিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের উন্নয়ন ঘটে ১৯৬০ দশকে। ১৯৭০ এর দশকে এ তত্ত্বের ব্যাপকতা লাভ করে। ব্যবস্থাপনা আধুনিক তত্ত্বের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যা নিম্নরূপ:

১. **সিস্টেমমুখিতা (System Orientated):** ব্যবস্থাপনার আধুনিক তত্ত্ব সিস্টেম ধারণা হতে উৎপত্তি। মূলত উপকরণ, প্রক্রিয়া, উৎপাদন ইত্যাদি অংশ যা সাবসিস্টেম নিয়ে গঠিত। এখানে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে একটি পূর্ণাঙ্গ সিস্টেম হিসাবে এবং প্রতিটি বিভাগ ও উপ-বিভাগকে উপ-সিস্টেম হিসাবে গণ্য করা হয়।

২. **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Scientific Method):** এ তত্ত্বে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনার যে কোনো সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পদক্ষেপগুলো যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে সমাধানের কথা বলা হয়েছে।

৩. **নমনীয়তা (Flexibility):** এ তত্ত্বকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানো অত্যন্ত উপযোগী একটি পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাই বিশ্বে এ তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. **চলকসমূহের আন্ত:নির্ভরশীলতা (Interdependence of Variable):** জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা হতে সংগৃহীত বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে আধুনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। এ ধারণায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উপাদানগুলো বা চলকগুলো পরস্পর নির্ভরশীল।

৫. **গতিশীলতা (Dynamic Process):** আধুনিক ব্যবস্থাপনাবিদদের মতে, সংগঠন একটি গতিশীল ও চলমান প্রক্রিয়া। সংগঠনে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে দ্রুত আন্ত:ক্রিয়া সম্পাদনের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।

৬. **বহুবিধ কারণ (Multiple Factors):** ব্যবস্থাপনার আধুনিক মতবাদে ধরে নেওয়া হয়, কোনো একটি ঘটনা বহুবিধ কারণের ফলশ্রুতি এবং সে কারণগুলো খুঁজে বের করে কার্যসম্পাদন করা হয়।

৭. **সম্ভাব্যতা (Probability):** ব্যবস্থাপনার আধুনিক তত্ত্বে কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নির্ণয় করে সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ তত্ত্বে কোনো ঘটনা ঘটার নিশ্চয়তার সাথে অনিশ্চয়তাকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়।

৮. **বর্ণনামূলক (Description):** মূলত আধুনিক ব্যবস্থাপন তত্ত্ব একটি বর্ণনামূলক, একইসাথে বিশ্লেষণমূলকও। তাই এটি কিরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে কোনো ধরনের ফলাফল পাওয়া যাবে, তা বর্ণনা করে থাকে।

৯. **মিশ্রদলের ব্যবহার (Use of Interdisciplinary Group):** এ তত্ত্বে কর্মকাণ্ড গবেষণা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মিশ্রদল ব্যবহার এবং গবেষণা পরিচালনা করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই এটি অধিক কার্যকর ও ফলপ্রসূ সিস্টেম হিসাবে বিবেচিত হয়।

১০. **বিকল্প নির্ভর (Relying in Alternatives):** এ তত্ত্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ও ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের সম্ভাবনা তত্ত্বের প্রয়োগ করা হয়। ফলে ত্রুটি-বিচ্যুতির মাত্রা কমে যায় বলে ধরা হয়।

সুতরাং বলা যায় যে, আধুনিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয়। উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোকে বাস্তবতা বিবেচনা করে এ তত্ত্ব ব্যবহার করা হলে উদ্দেশ্যার্জন সহায়ক হয়।

আধুনিক মতবাদের বিভিন্ন দিক

Different Aspects of Modern School

আধুনিক মতবাদের তিনটি দিক (প্রকারভেদ) রয়েছে। এগুলো হলো:

১। পরিমাণগত বা গাণিতিক বা সংখ্যাত্মক মতবাদ বা দিক;

২। সিস্টেম মতবাদ বা দিক;

৩। পরিস্থিতি বা সাপেক্ষতা বা বিকল্প মতবাদ বা দিক।

পরিমাণগত বা গাণিতিক বা সংখ্যাত্মক মতবাদ

Quantitative Approach

ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার পরিমাণগত বা গণিত বিষয়াদি অতি পুরাতন। সেনাবাহিনী প্রশাসনে এটির ব্যবহার দীর্ঘদিনের। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কার্য গবেষণায় এটি (Operation Research) ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ব্যবসায় বা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এর ব্যবহার খুবই সাম্প্রতিক। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্যবহৃত হয়। এটিকে গাণিতিক মতবাদ, কার্য গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিমাণগত কৌশল এবং গাণিতিক গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ, ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গাণিতিক প্রক্রিয়া, ধারণা, সাংকেতিক চিহ্ন, মডেল ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

সিস্টেম মতবাদ

Systems Approach

সিস্টেম (system) শব্দটির অনেক অর্থ আছে, যেমন: আত্মনির্ভরশীল সেট, পারস্পরিক ক্রিয়াশীল উপাদান, কতকগুলো ইউনিটের সমষ্টি যা এমনভাবে সমন্বিত এবং সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করে যাদের উৎপাদন স্বাধীনভাবে কাজ করে এমন ইউনিটের চেয়ে অধিক। এ মতবাদ অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা সর্বদা চেষ্টা করে একটি সংগঠিত উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং পরস্পর বিভিন্ন অংশ সম্বলিত একটি সংগঠন তৈরি করতে। বিভিন্ন অংশ আলাদাভাবে কাজ করবে না, বরং একত্রিতভাবে কাজ করবে। সিস্টেম অ্যাপ্রোচ অনুসরণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপকগণ একটি প্রতিষ্ঠানকে সার্বিকভাবে দেখার সুযোগ পায়। সংগঠন হলো বৃহৎ সিস্টেমের অংশ। যেমন: সংগঠন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বাস করে, অর্থনৈতিক সিস্টেমে থেকে কাজ করে এবং সমাজে এটি চালিত হয়।

পরিস্থিতি বা বিকল্প অ্যাপ্রোচ

Contingency or Situation Approach

পরিস্থিতি বা বিকল্প বলতে বুঝায় প্রয়োজনানুযায়ী বিকল্প কার্যসমূহ গ্রহণ করা। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিস্থিতিমূলক বা বিকল্প এর অর্থ হলো সকল পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য কোনো একক পদ্ধতিই ফলপ্রসূ নয় এবং ব্যবস্থাপকগণ এ ক্ষেত্রে কার্যসম্পাদনে যে-কোনো পন্থা ব্যবহারের জন্য স্বাধীন হন। এ মতবাদ অনুসারে ব্যবস্থাপনায় গতানুগতিক নীতি প্রয়োগ থেকে আধুনিক ধারায় পরিস্থিতি মোকাবিলায় অপর্যাপ্ত বলে মনে করেন। পরিস্থিতি অ্যাপ্রোচ প্রবর্তনকারীদের মূল ধারণা হলো প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তির প্রকৃতি, প্রতিষ্ঠানের আকার, আইনগত ব্যবস্থা, বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য উপাদান যা প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তিতে অসুবিধার সৃষ্টি করে, এগুলোকে সাংগঠনিক কাঠামোর সাথে সংগতিবিধান করতে হবে।

নেতৃত্বের তত্ত্ব বা মতবাদসমূহ

Theories or Approaches of Leadership

নেতৃত্ব হলো একটি গুণ যা দিয়ে মানুষকে কার্যসম্পাদনে প্রভাবিত করা যায়। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকদেরকে নেতৃত্বের গুণ থাকতে হয়, যা দিয়ে তারা কর্মীদেরকে দিয়ে কার্যসম্পাদন করিয়ে নাই এবং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জন করা সম্ভব হয়। বিভিন্ন গবেষকগণ বিভিন্ন সময়ে গবেষণা করে নেতৃত্বের কয়েকটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। এ সকল তত্ত্বকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১। নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য তত্ত্ব (Trait approach of leadership)
২। নেতৃত্বের আচরণ তত্ত্ব (Behavior theories of leadership)
৩। নেতৃত্বের পরিস্থিতি তত্ত্ব (Contingency theories of leadership)

নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য তত্ত্ব

Trait approach of leadership

নেতৃত্বের প্রাচীনতম তত্ত্ব হলো 'বৈশিষ্ট্য তত্ত্ব'। ১৯৪৯ সালের পূর্বে গবেষকগণ নেতৃত্ব সম্পর্কে গবেষণা করেন এবং নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য বা গুণ চিহ্নিত করার প্রয়াস পান। এটি নেতৃত্বের 'মহামানব' তত্ত্ব (Greatman Theory) হতে শুরু হয় এবং তখন বিশ্বাস করা হয় যে, নেতা 'জন্ম গ্রহণ করেন, তৈরি হয় না (Leaders are born, not made)।

এ তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য হলো কোনো ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ ব্যতিক্রম গুণ। যেমন: শারীরিক বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব, দক্ষতা ও যোগ্যতা এবং সামাজিক উপাদান। প্রাচীন রোমক ও গ্রীক (Romans and Greekes) গবেষকগণ বিভিন্ন ধরনের নেতার শারীরিক, মানসিক এবং ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বহু গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। Ralph M. Stogdill দেখতে পান যে, বিভিন্ন গবেষক নেতৃত্বের বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য উদ্ভাবন করেন। সেগুলো হল:

(i) পাঁচ ধরনের শারীরিক জ্ঞান, যেমন: শক্তি, চেহারা, উচ্চতা প্রভৃতি।
(ii) চারটি বুদ্ধিমত্তা ও সক্ষমতা বৈশিষ্ট্য।
(iii) ১৬ (ষোল) টি ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য, যেমন: খাপখাওয়ানোর যোগ্যতা, কাজ করার ক্ষিপ্রতা, অধ্যবসায় এবং আত্মবিশ্বাস।
(iv) ৬টি কার্যসম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য, যেমন: কৃতিত্ব অর্জনের চেষ্টা, উদ্যোগ গ্রহণ, কাজে অটুট থাকা ইত্যাদি।
(v) ৯ টি সামাজিক বৈশিষ্ট্য, যেমন: সহযোগিতা, আন্ত:দক্ষতা, প্রশাসনিক যোগ্যতা ইত্যাদি।

নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা, গবেষণা আজো চলমান আছে। অতি সম্প্রতি নেতৃত্বের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য উদ্ভাবন করা হয়েছে যা নেতার মধ্যে অবশ্যই বিদ্যমান থাকতে হবে। যেমন:

(i) প্রচেষ্টা: অর্জন, প্রেষণা, শক্তি, উচ্চাকাঙ্খা, উদ্যোগ এবং ধৈর্য্য প্রভৃতি।
(ii) নেতৃত্বের প্রেষণা: নেতৃত্ব দানের প্রত্যাশা কিন্তু ক্ষমতারোহন নয়। সততা ও সংহতি, আত্মবিশ্বাস, আবেগের স্থায়িত্ব এবং ব্যবসায় বুঝে উঠা।

এছাড়াও সম্পতি AT & T কোম্পানিতে একটি বিখ্যাত গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে যে, একজন নেতার মধ্যে অন্তত: কয়েকটি গুণ থাকতে হবে, যা তাকে আলাদা করে তোলে। যেমন: মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতা, মানবীয়সম্পর্ক দক্ষতা, মান্যতার ইচ্ছা, ক্লান্তি বা অবসন্নতা প্রতিরোধ, অনিশ্চয়তার মধ্যে ধৈর্য্য, শক্তি এবং সৃজনশীলতা ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা অগ্রসরতার জন্য প্রয়োজন বলে ধারণা করা হয়েছে।

যাই হোক, উপর্যুক্ত সকল গুণাবলি একজন নেতার মধ্যে থাকতে হবে এবং থাকতে পারে। তবে গুণের কোনো শেষ নাই। কিন্তু সকল নেতার মধ্যেই উক্ত সকল গুণ নাও থাকতে পারে। আবার নেতা নয়, এমন ব্যক্তির মধ্যেও উক্ত গুণাবলি থাকতে পারে।

এ তত্ত্বের একটি বড় অসুবিধা হলো এটি নির্দিষ্ট করে বলে দেয় না যে, একজন ব্যক্তির মধ্যে কতটুকু নেতৃত্ব সুলভ গুণ থাকতে হবে। গবেষকগণ এটিও নির্ণয় করতে সক্ষম হননি যে, বাস্তবে কোনগুলো নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য হবে। দেখা গেছে যে, অধিকাংশ গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- আচরণসংক্রান্ত।

যাইহোক, উক্ত আলোচনা থেকে এটুকু প্রতীয়মান হয় যে, একজন নেতার মধ্যে অবশ্যই উক্ত বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে, তবেই তিনি একজন সফল নেতা হিসাবে পরিগণিত হবেন।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ নেতৃত্বের বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করবেন।

সারসংক্ষেপ

আধুনিক (Modern) শব্দটি দ্বিধান্বিত। কারণ পরিস্থিতি সব সময় পরিবর্তনশীল এবং আজ যা আধুনিক, কাল তা পুরাতন, অকেজো এবং বর্জনীয়। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এফ. ডব্লিউ. টেলরের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ও হেনরি ফেয়লের ব্যবস্থাপনার সর্বজনীন নীতিমালা দিয়ে আধুনিকতা শুরু হয়েছে। কিন্তু এগুলো ব্যবস্থাপনার প্রাচীন ধারণা। আধুনিক বলতে অতি সাম্প্রতিক বুঝায়। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আধুনিক বলতে বুঝায় বহুমুখী শৃংখলা, বহু স্তরীয় এবং বহুমুখী ধারাকে বুঝায়। সাধারণত: ব্যবস্থাপনার ৫২ বছরের কার্যক্রমকে আধুনিক ব্যবস্থাপনা বলে অভিহিত করা হয়। ব্যবস্থাপনার আধুনিক তত্ত্ব কতকগুলো মৌলিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমনঃ আনুষ্ঠানিক সংগঠন, ভৌত পরিবেশ, সমন্বয় অর্থাৎ মানবীয় ও বস্তুবাচক সম্পদের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। ব্যক্তি আধুনিক ব্যবস্থাপনার মৌলিক উপাদান, প্রক্রিয়া সহযোগিতা প্রভৃতি। এ তত্ত্বের কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমনঃ সিস্টেমমুখিতা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ, নমনীয়তা, চলকসমূহের আন্ত:নির্ভরশীলতা, গতিশীলতা, বহুবিধ কারণ, সম্ভাব্যতা, বর্ণনামূলক, মিশ্রদলের ব্যবহার, বিকল্প নির্ভর ইত্যাদি। আধুনিক মতবাদের তিনটি দিক রয়েছে, যেমনঃ পরিবেশগত মতবাদ, সিস্টেম মতবাদ ও বিকল্প বা পরিস্থিতি মতবাদ। নেতৃত্বের প্রাচীনতম তত্ত্ব হলো 'বৈশিষ্ট্য তত্ত্ব'। ১৯৪৯ সালের পূর্বে গবেষকগণ নেতৃত্ব সম্পর্কে গবেষণা করেন এবং নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য বা গুণ চিহ্নিত করার প্রয়াস পান। এটি নেতৃত্বের 'মহামানব' তত্ত্ব (Greatman Theory) হতে শুরু হয় এবং তখন বিশ্বাস করা হয় যে, নেতা 'জন্ম গ্রহণ করেন, তৈরি হয় না (Leaders are born, not made)। এ তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য হলো কোনো ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ ব্যতিক্রম গুণ। যেমনঃ শারীরিক বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব, দক্ষতা ও যোগ্যতা এবং সামাজিক উপাদান। প্রাচীন রোমান ও গ্রীক (Romans and Greekes) গবেষকগণ বিভিন্ন ধরনের নেতার শারীরিক, মানসিক এবং ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বহু গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। Ralph M. Stogdill দেখতে পান যে, বিভিন্ন গবেষক নেতৃত্বের বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য উদ্ভাবন করেন।

পাঠ-৪.২ নেতৃত্বের আচরণ তত্ত্ব; নেতৃত্বের পরিস্থিতি তত্ত্ব
Behavior theories of leadership; Contingency theories of leadership

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নেতৃত্বের আচরণ তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- নেতৃত্বের পরিস্থিতি তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

নেতৃত্বের আচরণ তত্ত্ব
Behavior theories of leadership

নেতার আচরণের উপর গবেষণা করে নেতৃত্বের যে তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে, তাকে নেতৃত্বের আচরণ তত্ত্ব বলে। এ তত্ত্বের মূল বিষয় হল- নেতার সুআচরণের ওপরই নেতৃত্বের সফলতা নির্ভর করে বা ফলপ্রসূ হয়। আমেরিকার আইওয়া (Iowa) বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক Kurt Lewin ও তার সহকর্মীরা গবেষণা পরিচালনা করে বৈজ্ঞানিকভাবে নেতার আচরণ চিহ্নিত করার প্রয়াস পান; যা হলো: স্বৈরতান্ত্রিক (Autocratic), গণতান্ত্রিক (Democratic) ও লাগামহীন (Laisses faire)।

(ক) নেতৃত্বের আচরণ স্টাইলসমূহ:

(i) **স্বৈরতান্ত্রিক (Autocratic):** এ প্রসঙ্গে তারা মনে করেন যে, এটি নেতার এক ধরনের আচরণভিত্তিক স্টাইল যিনি এক তরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশ দেন, লক্ষ্য সম্পর্কে কর্মীদেরকে সীমিতকারে জ্ঞান দান করেন, শুধু পদক্ষেপের পর পদক্ষেপ কাজ করতে বলেন এবং মাঝে মাঝে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা উপহার দেন।

(ii) **গণতান্ত্রিক (Democratic):** তারা মনে করেন, এ ক্ষেত্রে নেতা সিদ্ধান্ত গ্রহণে দলকে অন্তর্ভুক্ত করেন, দলকেই কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করতে দেওয়া হয়, তারা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক লক্ষ্য সম্পর্কে জানেন এবং সহায়ক শিক্ষা গ্রহণের জন্য ফলাবর্তন ব্যবহার করা হয়।

(iii) **লাগামহীন (Laisses faire):** এ ক্ষেত্রে সাধারণত দলকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাদেরকে প্রয়োজনীয় উপকরণ দেওয়া হয়, নেতা শুধু প্রশ্নের উত্তর দেন এবং ফলাবর্তন এড়িয়ে চলেন। কোন নেতৃত্বের ধরন সবচেয়ে ফলপ্রসূ তা নির্ধারণের জন্য Lewin ও তার গবেষকগণ বিভিন্ন যুবকদেরকে প্রতিটি ধরন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেন এবং 'কিশোর বয়েজ ক্লাব'এর দলনেতার দায়িত্ব দেন। তারা দেখতে পান যে, প্রতিটি গ্রুপের মধ্যে লাগামহীন নেতৃত্বের কার্যসম্পাদনের মান সবচেয়ে খারাপ। অন্যদিকে, কাজের পরিমাণের দিক থেকে স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব সমান কিন্তু কাজের গুণগত মান ও সন্তুষ্টির কথা চিন্তা করলে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব সবচেয়ে ভাল।

উপরে বর্ণিত কোনো ধরনের নেতৃত্ব ব্যবস্থাপকগণ ব্যবহার করবেন বিশেষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, তা নির্ধারণ করতে বিখ্যাত গবেষক, ব্যবস্থাপনা বিশারদ Robert Tannenbaum ও Warren H. Schmidt নেতৃত্বের আচরণের বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ করেছেন। নীচে তা দেওয়া হলো :

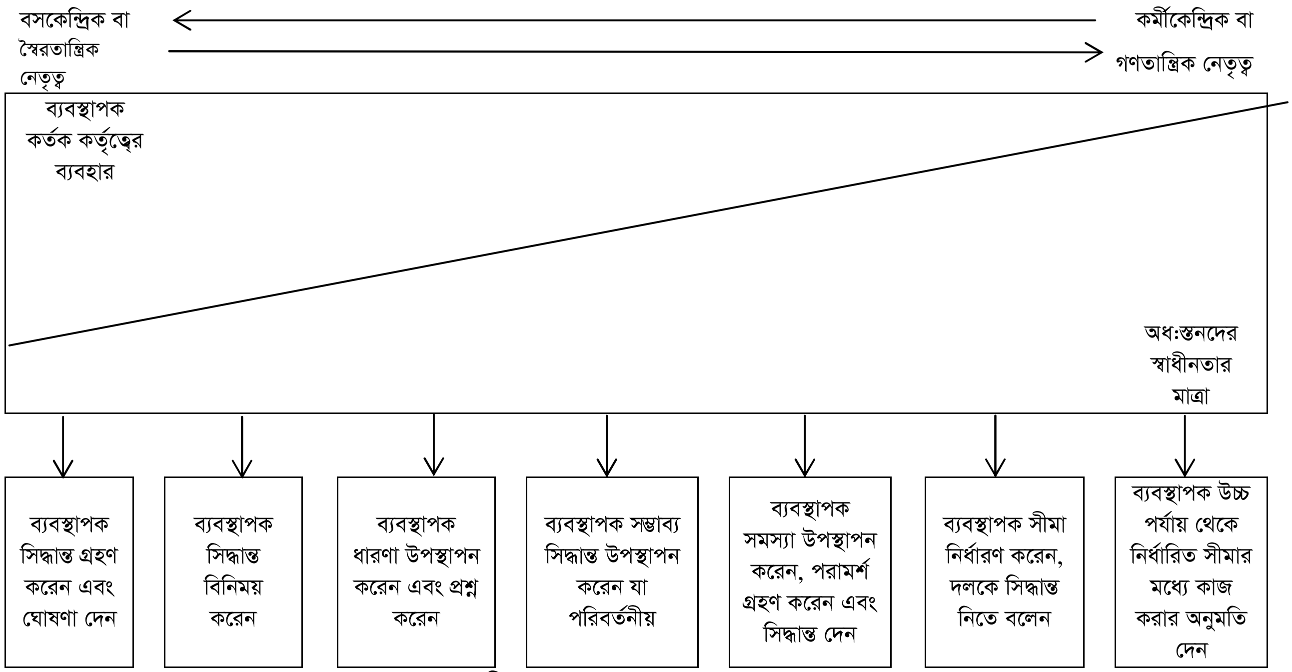

চিত্রঃ নেতৃত্বের আচরণ স্তর।

উৎসঃ Robert Tannenbaum & Warren H. Schunidr, “How to choose a leadership pattern.” Harvard.

চিত্রের সর্ববামে স্বৈরতান্ত্রিক বা বসকেন্দ্রিক কর্তৃত্ব ও সর্বডানে গণতান্ত্রিক বা কর্মীকেন্দ্রিক নেতৃত্ব এবং এ দুয়ের মাঝখানে আরও অন্যান্য নেতৃত্বর আচরণ পর্যায়ক্রমে প্রদর্শন করা হয়েছে। চিত্রে স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব থেকে শুরু করে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব পর্যন্ত একটি পথের সৃষ্টি হয়েছে। গবেষকগণ চিত্রে ব্যবহৃত ‘স্বৈরতান্ত্রিক’ নেতৃত্বকে একটু নরমভাবে উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। তারা বলেছেন যে, নেতৃত্বের এ ধরনটিতে শুধু শাস্তি দেওয়ার প্রবণতাই অন্তর্ভুক্ত আছে তা নয়, বা মূল লক্ষ্য অধীনস্তদের নিকট গোপন করে না। এ ক্ষেত্রে যেটি হয় , তা হলো বস (ম্যানেজার) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং অন্যান্যদেরকে জানান যে, তাদেরকে কী করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয় না।

গবেষকদের মতে, ব্যবস্থাপকদেরকে নেতৃত্বের ধরন নির্বাচনে পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে। তারা স্বল্প মেয়াদে পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে এবং দীর্ঘমেয়াদে কর্মীকেন্দ্রিক নেতৃত্ব অনুসরণের পরামর্শ দেন। এতে কর্মীদের প্রেষণা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের মান, দলগত কাজ, মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং কর্মীদের উন্নয়ন ঘটে।

অন্যদিকে, মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে (Michigan University) নেতৃত্বের আচরণ সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা করা হয়। সেখানেও কর্মীকেন্দ্রিক (Employee centered) ও কার্যকেন্দ্রিক (Job centered) বা উৎপাদনকেন্দ্রিক (Production centered) দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কর্মীকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে ফলপ্রসূ ‘কার্যদল’ (Work group) গঠনের প্রতি জোর দেওয়া হয় যাদের উচ্চ কার্যসম্পাদনের লক্ষ্য থাকবে। অন্যদিকে কার্যকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে নেতা কার্যসমূহকে বিভিন্নভাগে রুটিন মাফিক ভাগ করার চেষ্টা করেন এবং খুব কাছে থেকে তদারকি করেন। কর্মীকেন্দ্রিক নেতৃত্বের আচরণই ভালো ফলাফল দেয় কিন্তু মাঝে মধ্যে কার্যকেন্দ্রিক আচরণ কর্মীকেন্দ্রিক আচরণের চেয়ে ভালো ফল দেয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, নেতৃত্বের আচরণ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কর্মীকেন্দ্রিক (Democratic) ও বসকেন্দ্রিক (Autocratic) উভয় পদ্ধতিই কার্যকর, তবে স্থান-কাল অনুসারে। এক্ষেত্রে কর্মীকেন্দ্রিক পদ্ধতি-ই বেশি উপযোগী। তবে পরিস্থিতি পর্যালোচনাপূর্বক নেতাকে আচরণের ধরন ব্যবহার করতে হবে।

(খ) লাইকার্টের ব্যবস্থাপনার চার সিস্টেম

Likert's Four Systems of Management

মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রেনসিস্ লাইকার্ট (Rensis Likert) ও তার সহযোগীরা তিন দশক ধরে ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্বের ধরন সম্পর্কে গবেষণা করেন। গবেষণাকালে লাইকার্ট নেতৃত্বের আচরণ বুঝার জন্য কয়েকটি ধারণার উন্নয়ন করেন। তিনি দেখেন যে, একজন ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপক খুব বেশি কর্মীমুখী থাকেন, সকলকে এক ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত রেখে কার্যসম্পাদন করতে যোগাযোগের উপর ভরসা করেন। দলের সকল সদস্য নেতা বা ম্যানেজারসহ একে অন্যের সাধারণ প্রয়োজন, মূল্যবোধ, প্রত্যাশা, লক্ষ্য প্রভৃতি বিষয়ের সাথে অনুকূল মনোভাব পোষণ করেন। লাইকার্ট এ দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার ফলপ্রসূ উপায় বলে মনে করেন। গবেষণার পথ-নির্দেশনা এবং তার ধারণার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য লাইকার্ট ব্যবস্থাপনার চারটি সিস্টেমের কথা বলেছেন:

(i) **সিস্টেম-১ শোষকীয় কর্তৃপক্ষ (System-1 Explotive Authorittative):** সিস্টেম-১ এর অধীনে ব্যবস্থাপকগণ শোষক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তারা অত্যন্ত স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে থাকেন। অধীনস্তকে খুব কমই বিশ্বাস করেন। কর্মীদেরকে শাস্তির ভয় দেখিয়ে এবং মাঝে মধ্যে পুরস্কার দিয়ে প্রণোদিত করেন। তারা নিম্নগামী যোগাযোগে বিশ্বাসী।

(ii) **সিস্টেম-২ কল্যাণকামী কর্তৃপক্ষ (System-2 Benovolent Authoritative):** সিস্টেম-২ এর অধীনে ব্যবস্থাপকগণ তুলনামূলকভাবে কল্যাণমুখী হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকগণ দলগঠনে বিশ্বাস করে এবং অধীনস্তদের উপর বিশ্বাস আছে। কর্মীদের সাধারণত পুরস্কার দিয়ে প্রণোদিত করে, তবে মাঝে মধ্যে ভয় ও শাস্তি দিয়ে থাকে। তারা কিছু কিছু ঊর্ধ্বমুখী যোগাযোগ অনুমোদন করে। অধীনস্তদের নিকট থেকে কিছু ধারণা গ্রহণ করে এবং কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর্তৃত্ব হস্তান্তর করে কিন্তু অত্যন্ত কঠোর নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

(iii) **সিস্টেম-৩ পরামর্শমূলক (System-3 Consultative):** এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকদের অধীনস্তদের উপর উল্লেখযোগ্য বিশ্বাস আছে, তবে সম্পূর্ণ নয়। তারা অধীনস্তদের ধারণা ও মতামত ব্যবহার করার চেষ্টা করেন, পুরস্কারের মাধ্যমে প্রণোদিত করেন, তবে মাঝে মধ্যে শাস্তির ব্যবস্থা করে এবং কিছু অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়। যোগাযোগের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বমুখী ও নিম্নগামী উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করেন। বড় ও সাধারণ সিদ্ধান্ত উচ্চ পর্যায়ে এবং কিছু নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিচের স্তরে গ্রহণ করে থাকে এবং অন্যান্য সিদ্ধান্ত পরামর্শমূলকভাবে গ্রহণ করে থাকে।

(iv) **সিস্টেম-৪ অংশগ্রহণমূলক (System-4 Participative Group):** এ সিস্টেমের অধীন ব্যবস্থাপনাকে অংশগ্রহণমূলক দল হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকদের অধীনস্তদের উপর সব বিষয়ে পূর্ণ আস্থা থাকে। তারা সব সময় অধীনস্তদের নিকট থেকে ধারণা ও মতামত পেয়ে থাকে এবং গঠনমূলকভাবে তা ব্যবহার করা হয়। তারা লক্ষ্য নির্ধারণ এবং লক্ষ্য অর্জন কতটুকু সম্ভব হলো তা মূল্যায়নে দলগত অংশগ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট থাকার উপর ভিত্তি করে আর্থিক পুরস্কার প্রদান করে থাকে। তারা নিম্নমুখী ও ঊর্ধ্বগামী যোগাযোগই বেশি করে এবং পছন্দের দলের সাথে বেশি যোগাযোগ রক্ষা করে। সাধারণত লাইকার্ট দেখতে পান যে, যে সকল ব্যবস্থাপক তাদের কাজে সিস্টেম-৪ পদ্ধতি অনুসরণ করে, তারা নেতা হিসাবে অত্যন্ত সফল। তিনি উল্লেখ করেন যে, যে সকল কোম্পানি ও বিভাগ সিস্টেম-৪ পদ্ধতি অনুসরণ করে, তারা লক্ষ্য নির্ধারণ ও তা অর্জনে অত্যন্ত সফল এবং অধিক উৎপাদনশীল। তিনি এ সফলতার কারণ হিসাবে অধীনস্থদের অংশগ্রহণের মাত্রা ও তা চালিয়ে যাওয়াকে উল্লেখ করেন।

(গ) ব্যবস্থাপনা গ্রিড

Managerial Grid

নেতৃত্বের ধরন বর্ণনার জন্য একটি অতি পরিচিত অ্যাপ্রোচ বা পদ্ধতি হলো ব্যবস্থাপনা গ্রিড (Managerial Grid), যা Robert ও James Mouton আবিষ্কার করেন। যে ব্যবস্থায় কার্য ও কর্মীকে উদ্দেশ্য করে নেতার আচরণের উপর জোর দেওয়া হয় ও ফলাফল নির্ণয় করা হয়, তাকে ব্যবস্থাপনা গ্রিড বলা হয়। Black & Mouton এটিকে দক্ষতার সাথে নাটকীয়ভাবে বর্ণনা করেছেন। এটি পৃথিবীব্যাপী ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণের জন্য এবং বিভিন্ন ধরনের নেতৃত্বের মধ্যে সমন্বয়ের উপায় চিহ্নিতকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

গ্রিডের দিকসমূহ

The Grid Dimensions

ব্যবস্থাপনা গ্রিডের দুটি দিক রয়েছে, (i) কর্মীসংক্রান্ত দিক (People concern) এবং (ii) উৎপাদনসংক্রান্ত দিক (Production concern)। এক্ষেত্রে Black & Mouton 'সংশ্লিষ্টতা' (Concern for) বলতে বুঝিয়েছেন যে 'কীভাবে' (How) ব্যবস্থাপকগণ উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত এবং 'কীভাবে' (How) তারা কর্মীদের সাথে সম্পৃক্ত। তবে উৎপাদন সংশ্লিষ্টতা দিয়ে এটি বুঝায় না যে, একটি দলের নিকট থেকে 'কী পরিমাণ' (How much) উৎপাদনের সাথে তারা সংশ্লিষ্ট।

'উৎপাদন সংশ্লিষ্টতা' (Concern for production) দিয়ে অনেক কিছুর প্রতি ব্যবস্থাপকদের মনোভাব কী তা প্রকাশ করেন। যেমন: সিদ্ধান্ত গ্রহণের মান, কাজের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি, গবেষণার সৃজনশীলতা, কর্মীদের সেবার মান, কার্যদক্ষতা এবং উৎপাদনের পরিমাণ ইত্যাদি। 'কর্মী সংশ্লিষ্টতা' (Concern for people) এর অর্থ আরও ব্যাপক। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে- প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনে কর্মীদের ব্যক্তিগত অঙ্গীকারের মাত্রা, শ্রমিকদের নিজস্ব সম্মান রক্ষা করা, মান্যতার উপর ভিত্তি করে নয়, বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে দায়িত্ব প্রদান, উত্তম কার্যপরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং সন্তোষজনক আন্তঃসম্পর্ক রক্ষা করা ইত্যাদি।

চারটি চরম স্টাইল (Four extreme styles): Black ও Mouton চারটি চরম স্টাইলের উল্লেখ করেছেন। যেমন:

১.১ স্টাইল- নি:স্ব ব্যবস্থাপনা (Improverished Management)
৯.৯ স্টাইল- টিম ব্যবস্থাপনা (Team Management)
১.৯ স্টাইল- কর্মী সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা (Country Club Managment)
৯.১ স্টাইল- স্বৈরতান্ত্রিক কার্য ব্যবস্থাপনা (Autocratic Task Management)
৫.৫ স্টাইল- মধ্যম পন্থা ব্যবস্থাপনা (Middle Management)

নীচে চিত্রসহ এদের বিবরণ দেওয়া হলো:

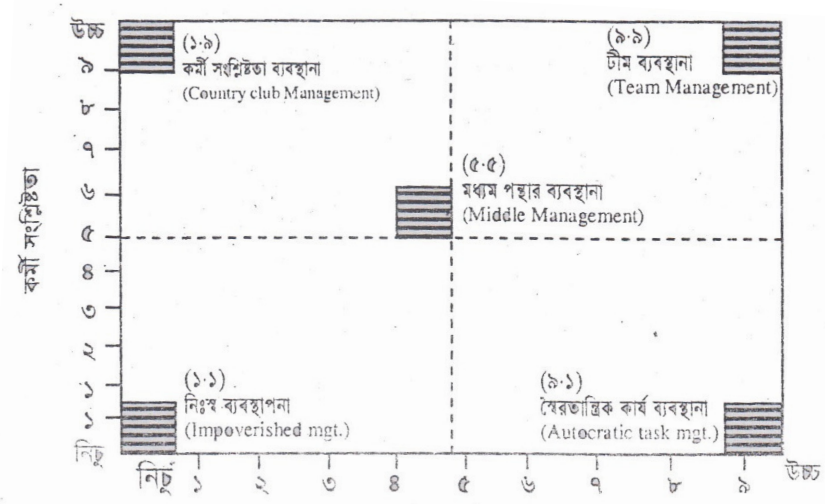

চিত্র : উৎপাদন সংশ্লিষ্টতা

চিত্র : ব্যবস্থাপনা গ্রীড

১। নি:স্ব ব্যবস্থাপনা (১.১) (Improverished Management): এ ধরনের ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থাপকগণ 'কর্মী' বা 'উৎপাদন' কোনোটির সাথেই তেমন সংশ্লিষ্ট থাকেন না এবং তারা তাদের কাজের সাথে ন্যূনতম সময় জড়িত থাকেন। তারা শুধু উচ্চ ব্যবস্থাপনা ও অধীনস্থদের মধ্যে যোগাযোগের কাজটি করেন, অনেকটা ম্যাসেঞ্জারের মতো কাজ করেন। এ জন্য এ ধরনের ব্যবস্থাপনাকে নি:স্ব ব্যবস্থাপনা বলা হয়েছে।

২। **টিম ব্যবস্থাপনা (৯.৯) (Team Management):** এ ধরনের ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ব্যবস্থাপকগণ 'কর্মী' বা 'উৎপাদন' উভয় বিষয়ের সাথে খুব বেশি সংশ্লিষ্ট থাকেন এবং উভয় দিকের প্রতি চরম আত্মত্যাগ করতে উদ্যত হন। তারা প্রতিষ্ঠান ও কর্মী উভয়েরই লক্ষ্যার্জনে ব্রতী হন। এজন্য তাদেরকে টিম ব্যবস্থাপক এবং তাদের কার্যক্রমকে টিম ম্যানেজমেন্ট (Team Management) বলে।

৩। **কর্মীসংশ্লিষ্ট বা কান্ট্রি ক্লাব ব্যবস্থাপনা (১.৯) (Country Club Management):** এ ধরনের ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থাপকগণ 'উৎপাদন সংক্রান্ত' বিষয়ে মোটেই ভাবেন না। শুধু কর্মীদেরকে নিয়ে ভাবেন। তারা শুধু কর্মীদের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন। তারা কার্য পরিবেশের উন্নয়ন সাধন করেন যেখানে কর্মীরা কার্যসাধনে সুখী ও আরাম বোধ করেন। কিন্তু কেউই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনে সমন্বিতভাবে এগিয়ে আসে না।

৪। **স্বৈরতান্ত্রিক কার্য ব্যবস্থাপনা (৯.১) (Autocratic Task):** এ ধরনের ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থাপকগণ শুধু উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন। তারা কর্মীদেরকে নিয়ে মোটেই ভাবেন না। কীভাবে কার্য পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করা যায়, তারা শুধু তা-ই নিয়েই ভাবেন। আর কর্মীদেরকে তারা স্বৈরতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালনা করেন।

৫। **মধ্যম ব্যবস্থাপনা (৫.৫) (Middle Management):**এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকগণ 'উৎপাদন' ও 'কর্মী' উভয়ের প্রতি মধ্যম পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট থাকেন। তারা খুব বেশি উচ্চাভিলাষী নন। অর্থাৎ তারা খুব উঁচু পর্যায়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করে না। তারা কর্মীদেরকে পরিচালনার ক্ষেত্রে কল্যাণমূলক স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব পোষণ করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনা গ্রিড ব্যবস্থাপক স্টাইল নির্ধারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ্ধতি। কিন্তু এটি আমাদেরকে বলে দেয় না যে, ব্যবস্থাপকরা কোনো গ্রিডের এক প্রান্ত বা অন্য প্রান্তে অবস্থান করে। অর্থাৎ, ব্যবস্থাপকরা কীভাবে উন্নতি লাভ করবেন সে বিষয়ে কোনো সঠিক দিক নির্দেশনা নাই। তবে এ ক্ষেত্রে কয়েকটি দিক মনে রাখতে হবে, তা হলো- নেতা বা অনুসারীদের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য, ব্যবস্থাপকদের সক্ষমতা ও প্রশিক্ষণ, প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ এবং অন্যান্য অবস্থাগত উপাদান, যা নেতা ও অনুসারীদের কার্যকে প্রভাবিত করে।

নেতৃত্বের পরিস্থিতি তত্ত্ব

Contingency theories of leadership

পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ বিবেচনা করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাকে পরিস্থিতিমূলক নেতৃত্ব বলে। বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে যে, পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে নেতা তৈরি হয় এবং তারা বিভিন্ন পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ তত্ত্বটি হলো প্রেরণামূলক তত্ত্ব যা ১৯৩০ সালে জার্মানে হিটলারের উত্থান থেকে বুঝা যায়। এ ছাড়াও বিশ্বের আরও কিছু বরেণ্য নেতা পরিস্থিতির কারণে আবির্ভূত হন, তারা হলেন- ইটালির মুসুলিনি, আমেরিকার রুজভেল্ট, চীনের মাও সি তুং (Mao Tse-ting) প্রমুখ। নেতৃত্বের এ ধরন থেকে বুঝা যায় যে, নেতা ও তার দলের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে নেতৃত্ব টিকে থাকে। অনুসারীরা তাকেই নেতা হিসাবে মেনে নেয় যাকে তারা অনুধাবন করতে পারে বা বুঝতে পারে। এ তত্ত্বকে ঘটনার আকস্মিতা তত্ত্বও বলা হয়। এ ক্ষেত্রে নেতারা এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকেন যা ঘটনার আকস্মিতার উপর নির্ভর করে বা কাজে লাগে। যেহেতু বিভিন্ন পরিস্থিতির উপাদান নেতৃত্বকে প্রভাবিত করে, তাই বিভিন্ন পরিস্থিতিমূলক তত্ত্ব বিবেচনা করা প্রয়োজন। নীচে পরিস্থিতিমূলক তত্ত্বসমূহ আলোচনা করা হলো:

(ক) ফিডলারের আকস্মিতা নেতৃত্ব তত্ত্ব (Fiedler's contingency Approach to leadership): পরিস্থিতিমূলক নেতৃত্ব তত্ত্বের মধ্যে বহুল আলোচিত তত্ত্ব হলো ফিডলারের আকস্মিতা নেতৃত্ব তত্ত্ব। এটি ইলিনয়েজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Fred Fiedler ও তার সহযোগীরা উদ্ভাবন করেন। এ তত্ত্বের মূলকথা হলো মানুষ শুধু তার ব্যক্তিত্বের গুণাবলি দিয়ে নেতা হয় না, বিভিন্ন পরিস্থিতির উপাদানের কারণে এবং দলগত সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের কারণেও নেতা হয়ে থাকে।

গবেষণার আলোকে Fiedler পরিস্থিতিমূলক নেতৃত্বের তিনটি জটিল দিক (Critical Dimensions) উল্লেখ করেছেন। নীচে এগুলো আলোচনা করা হল:

১। **পদের ক্ষমতা (Position Power):** এটি এমন ধরনের ক্ষমতা যা সাংগঠনিক কর্তৃত্ব হতে উদ্ভূত হয়। এটি ক্ষমতার মাত্রাকে বুঝায় যা দিয়ে নেতা তার অধীনস্তকে নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন। ফিডলার উল্লেখ করেন যে, ক্ষমতার মাত্রা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। তা হলে তারা অনুসারীদেরকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

২। **কার্য কাঠামো (Task Structure):** ফিডলার উল্লেখ করেন যে, কোনো কর্মী কতটুকু কাজ করবে, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে, যার জন্য তাদেরকে দায়ী করা যাবে। যদি কার্য পরিস্কারভাবে উল্লেখ করা হয়, তা হলে কাজের মান সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩। **নেতা-সদস্য সম্পর্ক (Leader Member Relations):** ফিডলারের মতে এটি নেতৃত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। কারণ পদের ক্ষমতা ও কার্য কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করতে হলে নেতার সাথে কর্মীরদের ভালো সম্পর্ক থাকতে হবে। সফল নেতৃত্ব নির্ভর করে তাদের নেতাকে তারা কতটুকু পছন্দ করে, বিশ্বাস করে এবং অনুসরণ করতে ইচ্ছা পূরণ করে, তার ওপর।

পরিশেষে বলা যায় যে, **Fielder** কর্তৃক প্রদত্ত তত্ত্বটি প্রমাণ করে যে, কোনো একটি স্টাইল-ই সর্বোত্তম নয় এবং নেতা জন্মগ্রহণই করে না, তৈরিও হয়। এছাড়া, প্রত্যেক ব্যবস্থাপকই উত্তম নেতা হতে পারে যদি তাদেরকে যোগ্যতা অনুযায়ী পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে দেওয়া হয়। সুতরাং এটি একটি উত্তম নেতৃত্ব স্টাইল।

(খ) নেতৃত্বের লক্ষ্যপথ তত্ত্ব (The Path-Goal Theory of Leadership): Robert House এ তত্ত্বের জনক। এ তত্ত্ব মতে, নেতার প্রধান কাজ হলো অধীনস্তদের সাথে বসে লক্ষ্যস্থির করা ও তার ব্যাখ্যা প্রদান করা, লক্ষ্যার্জনে সর্বোত্তম পন্থা নির্ধারণে সাহায্য করা এবং বাধা দূর করা। এ ছাড়াও, এ তত্ত্বানুযায়ী নেতার প্রথম কাজ হলো প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করবে, প্রত্যাশিত ও অর্জনযোগ্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা এবং তাদের আচরণ নির্দেশ করে দেওয়া যে উক্ত পুরস্কার অর্জনের জন্য কি ধরনের আচরণ প্রদর্শন করতে হবে। এ তত্ত্বে নেতার আচরণকে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হল:

১। **সমর্থনমূলক নেতৃত্ব (Supportive Leadership):** এ তত্ত্ব অনুযায়ী নেতা অধস্তনদের প্রতি বন্ধুত্বমূলক আচরণ করবে এবং মানুষ হিসাবে তাদেরকে বিবেচনা করবে। তাদের কল্যাণের জন্য কাজ করতে হবে এবং তাদের জন্য একটি সুন্দর সাংগঠনিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। তারা অসন্তুষ্ট ও হতাশ হলে তাদের কাজ ভালো হবে না।

২। **অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব (Participative Leadership):** প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অধীনস্তদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে এবং সম্ভব হলে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। এতে অধীনস্তরা প্ররোচিত হয় এবং উত্তমরূপে কার্যসম্পাদন করে।

৩। **নির্দেশনামূলক নেতৃত্ব (Directive/Instrumental Leadership):** এতে অনুসারীদেরকে বলে দেওয়া হয় যে, কি করতে হবে এবং কীভাবে তা করতে হবে। তাদেরকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে, প্রতিষ্ঠান তাদের নিকট কি প্রত্যাশা করে এবং কিছু পথনির্দেশনাও দেওয়া হয়।

৪। **কৃতিত্বার্জনমুখী নেতৃত্ব (Achievement Oriented Leadership):** এর অর্থ হলো অধীনস্তদের জন্য সংগ্রামমুখী লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় এবং তাদের কার্যসম্পাদনে উন্নয়ন প্রত্যাশা করা হয়। এছাড়াও, বিশ্বাস করা হয় যে, অধীনস্তরা অবশ্যই লক্ষ্যার্জনে সমর্থ হবে এবং এ বিষয়ে তারা যে সফল হবে, তা তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, লক্ষ্য পথ তত্ত্ব যে-কোনো নির্দিষ্ট নেতৃত্বের ধরনকে গুরুত্ব না দিয়ে বরং এটি পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে নেতৃত্বের ধরন ঠিক করে। এ তত্ত্বে মূল কথা হল- নেতা আচরণ ও লক্ষ্যের মধ্যে পথ ঠিক করে দেয়। এটি করা হয় পথ ও কার্যের ভূমিকা বর্ণনা করে, কার্যসম্পাদনে বাঁধা অপসারণ করে লক্ষ্য নির্ধারণে দলকে সাহায্য করে, দলগত প্রচেষ্টা ও ঐক্য উন্নয়ন করে, কার্যসম্পাদনে ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করে, ক্লান্তি বা অবসাদ ও বাহ্যিক নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে প্রত্যাশাকে স্পষ্ট করার মাধ্যমে এবং অন্য কিছু করার মাধ্যমে যা মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করে।

(গ) হারসে-ব্লেনচার্ড পরিস্থিতিমূলক তত্ত্ব (Hersery-Blanchard situational theory of leadership): এটি একটি বিখ্যাত পরিস্থিতিমূলক নেতৃত্ব তত্ত্ব যা হারসে ব্লেনচার্ড পরিস্থিতিমূলক তত্ত্ব নামে পরিচিত। কারণ এটি Paul Harsy Ken and Neth H. Blanchard উদ্ভাবন করেন। এটি এমন অঙ্গনের উপর ভিত্তি করে হয়েছে যে, নেতা একটি প্রধান পরিস্থিতির উপাদানের উপর নির্ভর করে আচরণ পরিবর্তন করে থাকে, তা হলো অনুসারীদের ইচ্ছা ও সক্ষমতা। এ তত্ত্বটি নেতার দুটি আচরণের উপর আলোকপাত করে যা ওহও স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের (OSU) অনুরূপ। আচরণ দুটি হলো-

১। **কার্য আচরণ (Task Behavior):** এটি একটি মাত্রা বুঝায় যে, কোন পর্যন্ত নেতা একজন ব্যক্তি বা দলের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে দেবে। অর্থাৎ এতে বলা হয় যে, কর্মী কী করবে, কীভাবে করবে, কোথায় করবে এবং কখন করবে।

২। **সম্পর্ক আচরণ (Relationship Behavior):** এটি হলো একটি মাত্রা যে, কোন পর্যন্ত নেতা যোগাযোগের দ্বি-মাত্রিক পন্থা বা বহুমাত্রিক পন্থা অবলম্বন করবেন। এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শ্রবণ, সহজিকরণ ও সহায়ক আচরণ।

নীচে চিত্রের মাধ্যমে তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা হলো-

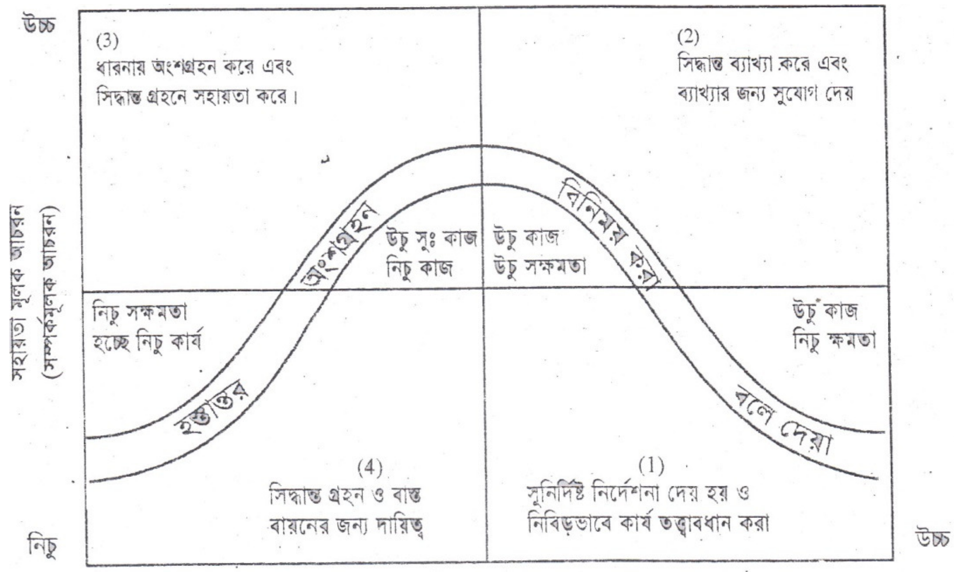

কার্য আচরন (Task Behavior)
(পথ নির্দেশনা)
অনুসারীদের সক্ষমতা ও ইচ্ছা

উঁচু	মধ্যম		নিচু
R_4	R_3	R_2	R_1
সক্ষম ও ইচ্ছুক বা আত্মবিশ্বাসী	সক্ষম কিন্তু ইচ্ছুক নয় বা অনিরাপদ	অক্ষম কিন্তু ইচ্ছুক বা আত্মবিশ্বাসী	অক্ষম ও অনিচ্ছুক বা অনিরাপদ

উৎস : Adopted from Barto & Martin. 'Management' p-424.

উপরের চিত্রে দুটি দিক রয়েছে, যেমন: একজন নেতা উভয় দিকে উঁচু হতে পারেন, উভয় দিকে নীচু হতে পারেন, অথবা, একটিতে উঁচু ও অন্যটিতে নীচু হতে পারেন। এখন নির্ধারণ করতে হবে যে, একটি পরিস্থিতিতে নেতা কোন সমন্বয়টি ব্যবহার করবেন। এক্ষেত্রে নেতাকে কোনো কাজে অনুসারীদের সক্ষমতা বা ইচ্ছা (readiness) পরিমাপ করতে হবে। সক্ষমতা ইচ্ছা (readiness) এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো- কোনো একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের সক্ষমতা, দক্ষতা, জ্ঞান

ও অভিজ্ঞতা। আবার ইচ্ছা (willingness) বলতে বুঝায়- বিশ্বাস, অঙ্গিকার ও প্রেষণা। চিত্রের নীচের অংশে ক্ষমতা তালিকাকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন- নিচু (R_1) মধ্যম (R_2) মধ্যম থেকে উঁচু (R_3) এবং উঁচু (R_4)।
অন্যদিকে ঘণ্টা আকৃতির (bell-shaped) রেখায় সক্ষমতার ক্ষেত্রে নেতৃত্বের চারটি ধরন উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন:

১। **বলে দেওয়া (Telling):** এটি কর্মীদের নীচু সক্ষমতা নির্দেশ করে। এ পরিস্থিতিতে কর্মীরা কোনো কাজের দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম বা তারা খুব অনিরাপদ বোধ করে। তাই এ ক্ষেত্রে তাদেরকে বলে দেওয়া হয় কী করতে হবে এবং কীভাবে করতে হবে।

২। **বিনিময় (Selling):** এটি মধ্যম পর্যায়ের সক্ষমতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। যখন কর্মীরা কোনো কাজের দায়িত্ব নিতে অক্ষম কিন্তু তাদের আগ্রহ আছে বা তারা নিজেকে আত্মবিশ্বাসী মনে করে। নেতৃত্বের বিনিময় স্টাইলে কর্মীদেরকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয় যা তাদের জন্য সহায়ক।

৩। **অংশগ্রহণমূলক (Participating):** এটি মধ্যম থেকে উঁচু সক্ষমতা নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে কর্মীগণ কাজের দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম,কিন্তু কাজ করতে অনিচ্ছুক বা অনিরাপদ বোধ করে। যেহেতু কর্মীরা কাজ করতে সক্ষম তাই এ ক্ষেত্রে নেতৃত্বের অংশগ্রহণমূলক ধরন অনুসরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে নেতা দ্বি-মাত্রিক যোগাযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

৪। **হস্তান্তর (Delegating):**এটি উচ্চ সক্ষমতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। যখন অনুসারীরা কোনো কাজ করতে সক্ষম ও ইচ্ছুক বা নিজেকে খুব আত্মবিশ্বাসী ভাবে। তাই এ ক্ষেত্রে নেতা দ্বি-মাত্রিক যোগাযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, নেতা কোন স্টাইলটি অনুসরণ করবে তা নির্ধারণের পূর্বে কর্মীদের সক্ষমতা ও ইচ্ছা এবং আত্মবিশ্বাস পরিমাপ করতে হবে। তবেই এ পরিস্থিতিমূলক নেতৃত্ব সফল হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ লাইকার্টের ব্যবস্থাপনার চার সিস্টেম ও ব্যবস্থাপনা গ্রিডের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করুন এবং নেতৃত্বের পরিস্থিতি তত্ত্ব বিশদভাবে খাতায় লিখবেন।

সারসংক্ষেপ

নেতার আচরণের উপর গবেষণা করে নেতৃত্বের যে তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে, তাকে নেতৃত্বের আচরণ তত্ত্ব বলে। এ তত্ত্বের মূল বিষয় হল- নেতার সুআচরণের ওপরই নেতৃত্বের সফলতা নির্ভর করে বা ফলপ্রসূ হয়। আমেরিকার আইওয়া (Iowa) বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক Kurt Lewin ও তার সহকর্মীরা গবেষণা পরিচালনা করে বৈজ্ঞানিকভাবে নেতার আচরণ চিহ্নিত করার প্রয়াস পান যা হলো: স্বৈরতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক ও লাগামহীন। এ প্রসঙ্গে তারা মনে করেন যে, এটি নেতার এক ধরনের আচরণভিত্তিক স্টাইল যিনি এক তরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারা মনে করেন, এ ক্ষেত্রে নেতা সিদ্ধান্ত গ্রহণে দলকে অন্তর্ভুক্ত করেন, দলকেই কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করতে দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে সাধারণত দলকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাদেরকে প্রয়োজনীয় উপকরণ দেওয়া হয়, নেতা শুধু প্রশ্নের উত্তর দেন এবং ফলাবর্তন এড়িয়ে চলেন। গবেষকদের মতে, ব্যবস্থাপকদেরকে নেতৃত্বের ধরন নির্বাচনে পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে। তারা স্বল্পমেয়াদে পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে এবং দীর্ঘ মেয়াদে কর্মীকেন্দ্রীক নেতৃত্ব অনুসরণের পরামর্শ দেন। এতে কর্মীদের প্রেষণা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের মান, দলগত কাজ, মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং কর্মীদের উন্নয়ন ঘটে। মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রেনসিস্ লাইকার্ট (Rensis Likert) ও তার সহযোগীরা তিন দশক ধরে ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্বের ধরন সম্পর্কে গবেষণা করেন। গবেষণাকালে লাইকার্ট নেতৃত্বের আচরণ বুঝার জন্য কয়েকটি ধারণার উন্নয়ন করেন। তিনি দেখেন যে, একজন ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপক খুব বেশি কর্মীমুখী থাকেন, সকলকে এক ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত রেখে কার্যসম্পাদন করতে যোগাযোগের উপর ভরসা করেন। দলের সকল সদস্য নেতা বা ম্যানেজারসহ একে অন্যের সাধারণ প্রয়োজন, মূল্যবোধ, প্রত্যাশা, লক্ষ্য প্রভৃতি বিষয়ের সাথে অনুকূল মনোভাব পোষণ করেন। লাইকার্ট এ দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার ফলপ্রসূ উপায় বলে মনে করেন। গবেষণার পথ-নির্দেশনা এবং তার ধারণার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য লাইকার্ট ব্যবস্থাপনার চারটি সিস্টেমের কথা বলেছেন- (i) সিস্টেম-১ শোষকীয় কর্তৃপক্ষ: সিস্টেম-১ এর অধীনে ব্যবস্থাপকগণ শোষক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। (ii) সিস্টেম-২ কল্যাণকামী কর্তৃপক্ষ: সিস্টেম-২ এর অধীনে ব্যবস্থাপকগণ তুলনামূলকভাবে কল্যাণমুখী হয়ে থাকে। (iii) সিস্টেম-৩ পরামর্শমূলক: এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকদের অধীনস্তদের উপর উল্লেখযোগ্য বিশ্বাস আছে, তবে সম্পূর্ণ নয়। (iv) সিস্টেম-৪ অংশগ্রহণমূলক: এ সিস্টেমের অধীন ব্যবস্থাপনাকে অংশগ্রহণমূলক দল হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। সাধারণত লাইকার্ট দেখতে

পান যে, যে সকল ব্যবস্থাপক তাদের কাজে সিস্টেম-৪ পদ্ধতি অনুসরণ করে, তারা নেতা হিসাবে অত্যন্ত সফল। নেতৃত্বের ধরন বর্ণনার জন্য একটি অতি পরিচিত অ্যাপ্রোচ বা পদ্ধতি হলো ব্যবস্থাপনা গ্রীড, যা Robert ও James Mouton আবিষ্কার করেন। যে ব্যবস্থায় কার্য ও কর্মীকে উদ্দেশ্য করে নেতার আচরণের উপর জোর দেওয়া হয় ও ফলাফল নির্ণয় করা হয়, তাকে ব্যবস্থাপনা গ্রীড বলা হয়। Black & Mouton এটিকে দক্ষতার সাথে নাটকীয়ভাবে বর্ণনা করেছেন। এটি পৃথিবীব্যাপী ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণের জন্য এবং বিভিন্ন ধরনের নেতৃত্বের মধ্যে সমন্বয়ের উপায় চিহ্নিতকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যবস্থাপনা গ্রিডের দুটি দিক রয়েছে, (i) কর্মী সংক্রান্ত দিক (ii) উৎপাদন সংক্রান্ত দিক। এক্ষেত্রে Black & Mouton 'সংশ্লিষ্টতা' বলতে বুঝিয়েছেন যে 'কীভাবে' ব্যবস্থাপকগণ উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত এবং 'কীভাবে' তারা কর্মীদের সাথে সম্পৃক্ত। তবে উৎপাদন সংশ্লিষ্টতা দিয়ে এটি বুঝায় না যে, একটি দলের নিকট থেকে 'কি পরিমাণ' উৎপাদনের সাথে তারা সংশ্লিষ্ট। Black ও Mouton চারটি চরম স্টাইলের উল্লেখ করেছেন। যেমনঃ ১. নিঃস্ব ব্যবস্থাপনা (১.১):এ ধরনের ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থাপকগণ 'কর্মী' বা 'উৎপাদন' কোনোটির সাথেই তেমন সংশ্লিষ্ট থাকেন না এবং তারা তাদের কাজের সাথে ন্যূনতম সময় জড়িত থাকেন। ২. টীম ব্যবস্থাপনা (৯.৯): এ ধরনের ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ব্যবস্থাপকগণ 'কর্মী' বা 'উৎপাদন' উভয় বিষয়ের সাথে খুব বেশি সংশ্লিষ্ট থাকেন এবং উভয় দিকের প্রতি চরম আত্মত্যাগ করতে উদ্যত হন। ৩. কর্মী সংশ্লিষ্ট বা কান্ট্রি ক্লাব ব্যবস্থাপনা (১.৯): এ ধরনের ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থাপকগণ 'উৎপাদন সংক্রান্ত' বিষয়ে মোটেই ভাবেন না। শুধু কর্মীদেরকে নিয়ে ভাবেন। ৪. স্বৈরতান্ত্রিক কার্য ব্যবস্থাপনা: এ ধরনের ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থাপকগণ শুধু উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন। তারা কর্মীদেরকে নিয়ে মোটেই ভাবেন না। ৫. মধ্যম ব্যবস্থাপনা (৫.৫): এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকগণ 'উৎপাদন' ও 'কর্মী' উভয়ের প্রতি মধ্যম পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট থাকেন। তারা খুব বেশি উচ্চাভিলাষী নন। পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ বিবেচনা করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাকে পরিস্থিতিমূলক নেতৃত্ব বলে। বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে যে, পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে নেতা তৈরি হয় এবং তারা বিভিন্ন পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ তত্ত্বটি হলো প্রেরণামূলক তত্ত্ব যা ১৯৩০ সালে জার্মানে হিটলারের উত্থান থেকে বুঝা যায়। **ফিডলারের আকস্মিতা নেতৃত্ব তত্ত্ব:** পরিস্থিতিমূলক নেতৃত্ব তত্ত্বের মধ্যে বহুল আলোচিত তত্ত্ব হলো ফিডলারের আকস্মিতা নেতৃত্ব তত্ত্ব। এটি ইলিনয়েজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Fred Fiedler ও তার সহযোগীরা উদ্ভাবন করেন। এ তত্ত্বের মূলকথা হলো মানুষ শুধু তার ব্যক্তিত্বের গুণাবলি দিয়ে নেতা হয় না, বিভিন্ন পরিস্থিতির উপাদানের কারণে এবং দলগত সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের কারণেও নেতা হয়ে থাকে।**নেতৃত্বের লক্ষ্যপথ তত্ত্ব :** Robert House এ তত্ত্বের জনক। এ তত্ত্ব মতে, নেতার প্রধান কাজ হলো অধীনস্তদের সাথে বসে লক্ষ্যস্থির করা ও তার ব্যাখ্যা প্রদান করা, লক্ষ্যার্জনে সর্বোত্তম পন্থা নির্ধারণে সাহায্য করা এবং বাধা দূর করা। সমর্থনমূলক নেতৃত্ব, অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব, নির্দেশনামূলক নেতৃত্ব, কৃতিত্বার্জনমুখী নেতৃত্ব। **হারসে-ব্লেনচার্ড পরিস্থিতিমূলক তত্ত্ব:** এটি একটি বিখ্যাত পরিস্থিতিমূলক নেতৃত্ব তত্ত্ব যা হারসে ব্লেনচার্ড পরিস্থিতিমূলক তত্ত্ব নামে পরিচিত। কারণ এটি Paul Harsy Ken and Neth H. Blanchard উদ্ভাবন করেন। এটি এমন অঙ্গনের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে যে, নেতা একটি প্রধান পরিস্থিতির উপাদানের উপর নির্ভর করে আচরণ পরিবর্তন করে থাকে, তা হলো অনুসারীদের ইচ্ছা ও সক্ষমতা। এ তত্ত্বটি নেতার দুটি আচরণের উপর আলোকপাত করে যা ওহও স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের (OSU) অনুরূপ। আচরণ দুটি হল- কার্য আচরণ ও সম্পর্ক আচরণ।

পাঠ-৪.৩ উৎকর্ষ আরোপন মতবাদ; সামাজিক ব্যবস্থা মতবাদ; অভিজ্ঞতাভিত্তিক মতবাদ; ব্যবস্থাপনা ভূমিকা মতবাদ; সিদ্ধান্ত মতবাদ; পুন:প্রকৌশল মতবাদ

The Attributes of Excellence Approach; Social System Approach; Experimental Approach; Management Role Approach; Decision Approach; Re-engineering Approach

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উৎকর্ষ আরোপন মতবাদ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- সামাজিক ব্যবস্থা মতবাদ বলতে পারবেন;
- অভিজ্ঞতাভিত্তিক মতবাদ বর্ণনা করতে পারবেন;
- ব্যবস্থাপনা ভূমিকা মতবাদ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- সিদ্ধান্ত মতবাদ ও পুন:প্রকৌশল মতবাদ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

উৎকর্ষ আরোপন মতবাদ

The Attributes of Excellence Approach

দুজন বিখ্যাত ব্যবস্থাপনা পরামর্শক (Consultant) টমাস জে. পিটার্স ও রবার্ট এইচ, ওয়াটারম্যান জুনিয়র গবেষণার মাধ্যমে ব্যবস্থাপকদের এমন কিছু "গুণাবলি" (attributes) উদ্ভাবন করেছেন যা ব্যবস্থাপকদের কার্যে উৎকর্ষতা অর্জনের সহায়ক। এ সকল গুণাবলি বা নির্ণায়কসমূহ প্রয়োগ করে ব্যবস্থাপকগণ তাদের কাজে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। এজন্য এগুলোকে একত্রে "উৎকর্ষতার গুণাবলি বা নির্ণায়কসমূহ অ্যাপ্রোচ" বলে অভিহিত করা হয়। ১৯৮২ সালে টমাস জে. পিটার্স ও রবার্ট এইচ. ওয়াটারম্যান জুনিয়র "In Search of Excellence" নামে একটি পুস্তক রচনা করেন এবং এ পুস্তকে উৎকর্ষতার নির্ণায়ক বা গুণাবলি অ্যাপ্রোচটি বিধৃত করেন। তারা তাতে বলার প্রয়াস পান যে, আমেরিকার নামিদামি কোম্পানিগুলো কীভাবে সফলতা লাভে সক্ষম হয়েছে। ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞগণ এ অ্যাপ্রোচটিকে কয়েকটি কারণে গতানুগতিক বা সাধারণ ধারা থেকে আলাদা বলে অভিহিত করেন। কারণগুলো হলো:

১. তারা গতানুগতিক ব্যবস্থাপনাকে রক্ষণশীল, আবেগহীন, অনমনীয়, নেতিবাচক ও বাগাড়ম্বর বলে অভিহিত করেন।
২. তারা গতানুগতিক ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি যেমন: পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির পরিবর্তে নতুন পরিভাষা যেমন: ঘুরে বেড়ানোভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (Management by wandering Around) ব্যবহার করেন।
৩. তারা গবেষণার মূল বিষয়কে সংখ্যাত্মক তথ্যের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেননি। তার পরিবর্তে গল্প বা কাহিনির মাধ্যমে তা উপস্থাপনের প্রয়াস পান।

উৎকর্ষতার আটটি নির্ণায়ক

Eight Attributes of Excellence

যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনাসম্পন্ন ৩৬ টি কোম্পানির উপর নিবিড় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সেখানে পিটার্স ও ওয়াটারম্যান উৎকর্ষতার ৮টি নির্ণায়ক আবিষ্কার করেন। এগুলি নিম্নরূপ:

১. কাজের প্রতি আগ্রহ (A bias for action);
২. ক্রেতাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা (Close to the customer);
৩. নিজ প্রশাসন ও উদ্যোগ (Autonomy & Enterpreneurship);
৪. শ্রমিক-কর্মীদের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা (Productivity through people);
৫. সতর্কতা ও মূল্যবোধ তাড়িত (Hands on and value driven);
৬. দৃঢ়তার সাথে যুক্ত থাকা (Stick to the knitting);
৭. সহজ ধরন, স্বল্প অফিসকর্মী (Simple form, Loan staff);
৮. একই সাথে ঢিলা-শক্ত গুণ (Simultaneousy Lose-tight properties);

সামাজিক সিস্টেম মতবাদ

Social System Theory or Approach

এ মতবাদে বিশ্বাসীদের মধ্যে চেষ্টার আই, বানার্ড অন্যতম। তিনি সংগঠনকে একটি অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যাহোক, এ মতবাদের মূল কথা হলো- মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া মানুষ বসবাস করতে পারে না। তাই তারা যেখানে কাজ করে অর্থাৎ, সংগঠনে কাজ করে। তাই সংগঠন একটি সামাজিক সিস্টেম যেখানে ব্যবস্থাপক-কর্মী সকলেই পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত। সুতরাং এ মতবাদের প্রবক্তাগণ সংগঠন ও ব্যবস্থাপনাকে একটি সামাজিক সিস্টেম হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আর এ মতবাদের কেন্দ্রবিন্দু হলো- যোগাযোগ। এ ছাড়াও আরও দুটি প্রক্রিয়া রয়েছে এ ক্ষেত্রে, যেমন: সমতা বিধান করা এবং সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই হলো সামাজিক সিস্টেমের মূল মন্ত্র। সুতরাং এ তত্ত্বের কতিপয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায়-

১. সংগঠন হলো একটি সামাজিক প্রক্রিয়া;
২. সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্যদের সহযোগিতা করাই ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য;
৩. দলীয় উদ্দেশ্যের সাথে সংগঠনের উদ্দেশ্যকে একত্র করে যৌথভাবে সকলে কাজ করবে;
৪. প্রতিষ্ঠানে যেন সংঘাত সৃষ্টি না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে ব্যবস্থাপকদের।

পরিশেষে বলা যায় যে, সামাজিক সিস্টেম মতবাদের মূল কথা হলো সকলে যৌথ মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যার্জনে কাজ করতে হবে। এখানে দলীয় স্বার্থ ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থকে এক করে দেখা হয়।

পরীক্ষামূলক বা ঘটনা মতবাদ বা অভিজ্ঞতাভিত্তিক মতবাদ

Empirical Case Approach

বৈশিষ্ট্য	সীমাবদ্ধতা	চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা
১. অভিজ্ঞতার আলোকে ঘটনা বিশ্লেষণ। ২. সাফল্য ও ব্যর্থতা চিহ্নিতকরণ।	১. প্রতিটি অবস্থা বা ঘটনা আলাদা। ২. নীতি চিহ্নিতকরণে কোনো প্রচেষ্টা নাই। ৩. ব্যবস্থাপনাতত্ত্ব উন্নয়নে সীমিত মূল্যায়ন	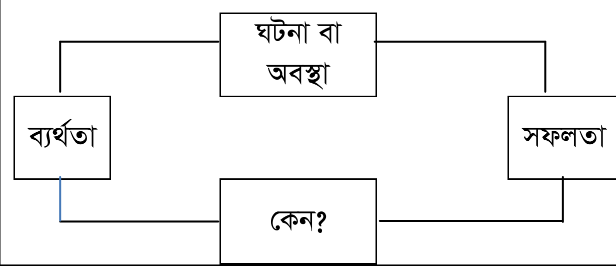

ব্যবস্থাপনা ভূমিকা মতবাদ

The Management Roles Approach

ব্যবস্থাপনা ভূমিকা অ্যাপ্রোচ বা স্কুল সাম্প্রতিককালে উদ্ভাবিত বিভিন্ন মতবাদসমূহের মধ্যে অন্যতম। এটি কানাডায় অবস্থিত ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেনরি মিনসবার্গ এ মতবাদের উদ্ভাবক। তিনি মনে করেন যে, ব্যবস্থাপকগণ যে সকল কার্যসম্পাদন করেন তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই ব্যবস্থাপকদের ভূমিকা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। অর্থাৎ, ব্যবস্থাপকগণ কর্তৃক সম্পাদিত সাধারণ কার্যকমই ব্যবস্থাপকদের ভূমিকা নির্ধারণ করে দেবে। অধ্যাপক মিনসবাস বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৫ (পাঁচ) জন প্রধান নির্বাহীর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখেন যে, তাদের গতানুগতিক ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি যেমন: পরিকল্পনা সংগঠন, সমন্বয় সাধন, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি। কার্যক্রমের পরিবর্তে অন্যান্য নানাবিধ কার্যক্রমে বেশি নিয়োজিত থাকে। অন্যান্য কার্যাবলির মধ্যে নীচে উল্লিখিত কার্যক্রমই প্রধান।

(ক) আন্ত:ব্যক্তিক ভূমিকা (Inter-Personal Roles):

১। নামমাত্র প্রধানের ভূমিকা (The figure head role);
২। নেতার ভূমিকা (The Leader role);
৩। জনসংযোগের ভূমিকা (The Laison role);

(খ) তথ্যসংক্রান্ত ভূমিকা (Informational Roles):
১। প্রাপকের ভূমিকা (The Recipient role);
২। প্রচারকের ভূমিকা (The Disseminator’s role);
৩। মুখপাত্রের ভূমিকা (The Spokesperson role)।

(গ) সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা (Decision Roles):
১। উদ্যোক্তার ভূমিকা (Enterpreneurial role)
২। সমস্যা মোকাবিলা করার ভূমিকা (The Disturbance handler role);
৩। সম্পদ বন্টনকারীর ভূমিকা (The Resource allocator role);
৪। মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা (The negotiator role)।

সমালোচনা
Criticism
মিনসবার্গ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থাপনা ভূমিকা মতবাদের কিছু সমালোচনাও রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ:
১. এটি অল্প কয়েকজন প্রধান নির্বাহীর উপর গবেষণা চালিয়ে ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
২. ব্যবস্থাপকগণ এমন অনেক কাজ করেন যা ব্যবস্থাপনা নয়। যেমন: অর্থসংগ্রহ, গণসংযোগ, প্রচারণা ইত্যাদি।
৩. মিনসবার্গ ব্যবস্থাপকদের যে সকল কার্যাবলির কথা বলেছেন, সেগুলো ব্যবস্থাপনার সাধারণ কার্যাবলির বাইরে নয়।
৪. মিনসবার্গ ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির যে তালিকা প্রণয়ন করেছেন, তা অসম্পূর্ণ। যেমন: সেখানে ব্যবস্থাপনার কাঠামো নির্ধারণ, ব্যবস্থাপকদের নির্বাচন, কার্যসম্পাদনের স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ প্রভৃতি স্থান পায়নি।

পরিশেষে বলা যায় যে, যদিও মিনসবার্গের উদ্ভাবিত অ্যাপ্রোচের সমালোচনা করা হয়েছে, তথাপি এটি ব্যবস্থাপকদের কার্যসম্পাদন ও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাই বলেছে।

সিদ্ধান্ত তত্ত্ব মতবাদ
Decision Theory Approach

বৈশিষ্ট্য	সীমাবদ্ধতা	চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা
১. সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর আলোকপাত, ব্যক্তিক বা দলীয় সিদ্ধান্তগ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া। ২. কতিপয় তত্ত্ববিদ প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম বিশ্লেষণে সিদ্ধান্তকে স্প্রিংবোর্ডের মতো ব্যবহার করেছে। ৩. গবেষণার সীমা স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট নয়।	১. সিদ্ধান্ত গ্রহণের তুলনায় ব্যবস্থাপনার কাজ বেশি। ২. একই সময়ে সংকীর্ণ ও উদার উভয় দিকে আলোকপাত করে।	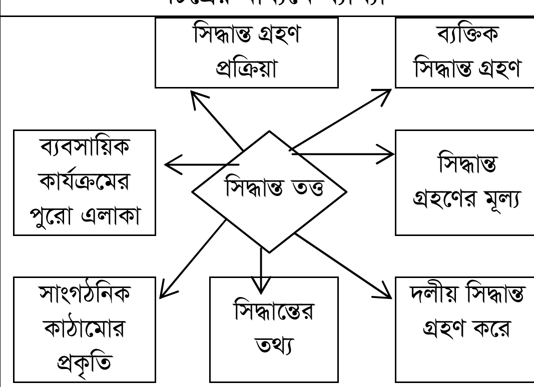

পুন: প্রকৌশল মতবাদ
Recngineering Approach

বৈশিষ্ট্য	সীমাবদ্ধতা	চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা
১. মৌলিক বিষয়সমূহে পুন:চিন্তা ২. প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ ৩. দ্রুত পুন:সজ্জিতকরণ	১. কর্মীদের মানবীয় দিকের প্রতি উদাসীনতা। ২. ভোক্তাদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি না দেওয়া।	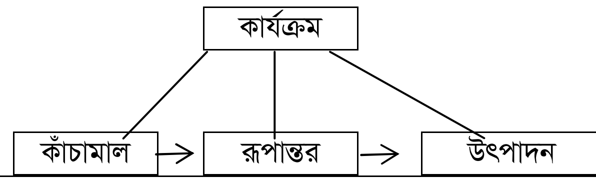

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ উৎকর্ষ আরোপন মতবাদ, সামাজিক ব্যবস্থা মতবাদ, অভিজ্ঞতাভিত্তিক মতবাদ এবং ব্যবস্থাপনা ভূমিকা মতবাদ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনাপূর্বক জ্ঞান ঝালাই করে নিন।

সারসংক্ষেপ

যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনাসম্পন্ন ৩৬টি কোম্পানির উপর নিবিড় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সেখানে পিটার্স ও ওয়াটারম্যান উৎকর্ষতার ৮টি নির্ণায়ক আবিষ্কার করেন। এগুলো হলো: ১. কাজের প্রতি আগ্রহ ২. ক্রেতাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা ৩. নিজ প্রশাসন ও উদ্যোগ ৪. শ্রমিক-কর্মীদের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ৫. সতর্কতা ও মূল্যবোধ তাড়িত ৬. দৃঢ়তার সাথে যুক্ত থাকা ৭. সহজ ধরন, স্বল্প অফিসকর্মী ৮. একই সাথে ঢিলা-শক্ত গুণ। এ মতবাদে বিশ্বাসীদের মধ্যে চেষ্টার আই, বানার্ড অন্যতম। তিনি সংগঠনকে একটি অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যাহোক, এ মতবাদের মূল কথা হলো- মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া মানুষ বসবাস করতে পারে না। তাই তারা যেখানে কাজ করে অর্থাৎ সংগঠনে কাজ করে। তাই সংগঠন একটি সামাজিক সিস্টেম যেখানে ব্যবস্থাপক-কর্মী সকলেই পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত। সুতরাং এ মতবাদের প্রবক্তাগণ সংগঠন ও ব্যবস্থাপনাকে একটি সামাজিক সিস্টেম হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আর এ মতবাদের কেন্দ্রবিন্দু হলো- যোগাযোগ। এ ছাড়াও আরও দুটি প্রক্রিয়া রয়েছে এ ক্ষেত্রে, যেমন: সমতা বিধান করা এবং সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই হলো সামাজিক সিস্টেমের মূল মন্ত্র। ব্যবস্থাপনা ভূমিকা অ্যাপ্রোচ বা স্কুল সাম্প্রতিককালে উদ্ভাবিত বিভিন্ন মতবাদসমূহের মধ্যে অন্যতম। এটি কানাডায় অবস্থিত ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেনরি মিনসবার্গ এ মতবাদের উদ্ভাবক। তিনি মনে করেন যে, ব্যবস্থাপকগণ যে সকল কার্যসম্পাদন করেন তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই ব্যবস্থাপকদের ভূমিকা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। অর্থাৎ ব্যবস্থাপকগণ কর্তৃক সম্পাদিত সাধারণ কার্যকমই ব্যবস্থাপকদের ভূমিকা নির্ধারণ করে দেবে। অধ্যাপক মিনসবার্গ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৫ (পাঁচ) জন প্রধান নির্বাহীর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখেন যে, তাদের গতানুগতিক ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি যেমন: পরিকল্পনা সংগঠন, সমন্বয় সাধন, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি। কার্যক্রমের পরিবর্তে অন্যান্য নানাবিধ কার্যক্রমে বেশি নিয়োজিত থাকে। অভিজ্ঞতাভিত্তিক মতবাদ: এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন: ১. অভিজ্ঞতার আলোকে ঘটনা বিশ্লেষণ। ২. সাফল্য ও ব্যর্থতা চিহ্নিতকরণ। এর সীমাবদ্ধতাও রয়েছে যেমন: ১. প্রতিটি অবস্থা বা ঘটনা আলাদা। ২. নীতি চিহ্নিতকরণে কোনো প্রচেষ্টা নাই। ৩. ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব উন্নয়নে সীমিত মূল্যায়ন।

পাঠ-৪.৪ সংখ্যাত্মক মতবাদ; সিস্টেম মতবাদ
Quantitative Approach; System Approach

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সংখ্যাত্মক মতবাদ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- সিস্টেম মতবাদ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

পরিমাণগত বা গাণিতিক বা সংখ্যাত্মক মতবাদ
Quantitative Approach

ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার পরিমাণগত বা গণিত বিষয়াদি অতি পুরাতন। সেনাবাহিনী প্রশাসনে এটির ব্যবহার দীর্ঘদিনের। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কার্য গবেষণায় এটি (Operation Research) ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ব্যবসায় বা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এর ব্যবহার খুবই সাম্প্রতিক। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্যবহৃত হয়। এটিকে গাণিতিক মতবাদ, কার্য গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিমাণগত কৌশল এবং গাণিতিক গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ, ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গাণিতিক প্রক্রিয়া, ধারণা, সাংকেতিক চিহ্ন, মডেল ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। P.M.S Blacket, H. A. Simon, M. G. Kendall, J. Von Neumann প্রমুখ এ মতবাদের মূল অবদানকারী। সিদ্ধান্ত তত্ত্ব, মজুত নিয়ন্ত্রণ, রৈখিক কর্মসূচীকরণ সম্ভাবনা তত্ত্ব, সাইমুলেশন তত্ত্ব প্রভৃতি এ তত্ত্বের কয়েকটি বিশেষ দিক যা বিশেষজ্ঞগণ আবিষ্কার ও প্রয়োগ করেছেন। ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান সকল দিকের ব্যবস্থাপনা সমস্যা মোকাবিলা করতে সক্ষম না হলেও উল্লিখিত কৌশলগুলো ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

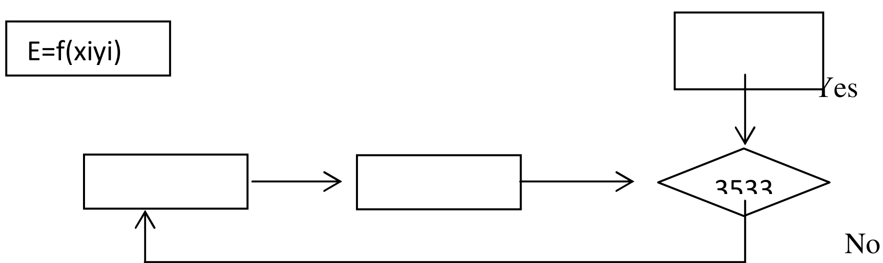

চিত্র: গাণিতিক মতবাদ

ব্যবস্থাপনার সংখ্যাত্মক তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য
Features of Quantitative Theory of Management

সংখ্যাত্মক তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গাণিতিক পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দেওয়া। সংখ্যাত্মক মতবাদের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলো নিম্নরূপ:

১. **সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ (Presenting in formula):** সংখ্যাত্মক তত্ত্বে গণিত, পরিসংখ্যান ও মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ হয়ে থাকে।

২. **কম্পিউটারের ব্যবহার (Use of Computer):** ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানে কম্পিউটারের ব্যবহার ও কম্পিউটারের প্রবর্তন সংখ্যাত্মক তত্ত্বের ধারণাকে ব্যাপক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. **লক্ষ্যার্জন (To Achieve goal):** সংখ্যাত্মক তত্ত্বের মূল কথা হলো সঠিক পরিকল্পনা ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জন করা।

৪. **মডেল (Model):** এ তত্ত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো গাণিতিক মডেল প্রয়োগ করে পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকারিতা যাচাই করা।

৫. **সামঞ্জস্য (Consistancy):** ব্যবস্থাপনার সংখ্যাতম তত্ত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সিদ্ধান্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া।

সংখ্যাত্মক তত্ত্বের সুবিধা বা গুরুত্ব বা ইতিবাচক দিক

Advantages or Importance or Positive of Quantitative Theory

ব্যবস্থাপনা সংগঠনে সংখ্যাত্মক তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংখ্যাত্মক তত্ত্বের অবদান অপরিসীম। নিম্নে এ তত্ত্বের ইতিবাচক দিকগুলো উল্লেখ করা হলো:

১. **সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা (Assist is decision making):** ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংখ্যাত্মক তত্ত্ব ব্যবহার করে থাকে। তাই এ তত্ত্ব সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য।

২. **ধারণা উন্নয়ন (Developing Concept):** এ তত্ত্বে গাণিতিক মডেল ব্যবহারের ফলে জটিল সাংগঠনিক কাঠামো এবং সাংগঠনিক পরিবেশ সম্পর্কে সঠিক ধারণার উন্নয়ন ঘটে। প্রয়োজনবোধে সংশোধন করা যায়।

৩. **উন্নতর কৌশল (Strategy for Improvement):** ব্যবস্থাপনার একটি উন্নততর কৌশল হিসাবে সংখ্যাত্মক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। ফলে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নে এ তত্ত্ব সহায়ক হয়।

৪. **পরিকল্পনার সহায়তা (Helping Planning):** সংগঠনে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে সংখ্যাত্মক মতবাদ কার্যকরি ভূমিকা পালন করে।

৫. **নিয়ন্ত্রণ (Control):** সংগঠনের জন্য নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ তত্ত্বে পূর্ব থেকে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি জানা থাকে বিধায় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়।

৬. **মূল্যায়ন (Valuation):** এ তত্ত্বে বিজ্ঞানের সঠিক ব্যবহার করা হয়। ফলে কার্যকারিতা পরিমাপে একটি সেটের আলোকে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।

সুতরাং বলা যায় যে, সংখ্যাত্মক তত্ত্ব ব্যবস্থাপনা একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি।

সংখ্যাত্মক তত্ত্বের দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতা

Weakness/Limitations of Quantitative Theory

সংখ্যাত্মক তত্ত্বের সুবিধার পাশাপাশি অনেক সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো:

১. **দ্বন্দ্ব (Conflict):** আচরণগত জ্ঞানের অভাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদের আচরণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় না। ফলে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বা শ্রমিক-কর্মীদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি এবং কার্যক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হতে পারে।

২. **গ্রহণযোগ্যতার অভাব (Lack of Acceptability):** অন্যের মতামত বা প্রাধান্যকে উপেক্ষা করে গাণিতিক তত্ত্ব ব্যবহার করা হয়। এখানে স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বজায় রাখা সম্ভব হয় না।

৩. **সংখ্যাত্মক বিশ্লেষণ (Quantitative Analysis):** সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংখ্যাত্মক বিশ্লেষণ করা হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুণগত বিষয় উপেক্ষা করা হয়। ফলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়।

৪. **ব্যয় বৃদ্ধি (Increase Expenditure):** ব্যবস্থাপনা সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গাণিতিক কলাকৌশল ব্যবহারে পক্ষে যুক্তিতর্ক দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ব্যবস্থাপনা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। তাই গাণিতিক পদ্ধতি ব্যবহারে সাফল্যার্জন অনেকটাই কঠিন।

৫. **অনুমান নির্ভর (Assumption):** সংখ্যাত্মক তত্ত্বে ব্যবহৃত গাণিতিক মডেল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবাস্তব ও কল্পনাপ্রসূত অনুমিতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। ফলে এর কার্যকারিতার প্রমাণ অত্যন্ত কঠিন।

৬. **মনোবিজ্ঞানিক বিষয় (Psychological Facts):** কর্মীদের মনস্তাত্ত্বিক বিষয় যেমন: প্রেরণা, আবেগ, অনুমতি, ব্যক্তিগত মতামত ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়। তাই এ তত্ত্বের ফলাফল বাস্তবে প্রয়োগ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

সুতরাং বলা যায় যে, পরিসংখ্যান পদ্ধতি ও গাণিতিক কৌশল ব্যবহার করে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় তা দিয়ে বাস্তব অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করা অত্যন্ত জটিল।

সংখ্যাত্মক তত্ত্বের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উপায়

Ways to Resolve Problem by Using Quantitative Theory

সংখ্যাত্মক মতবাদ হলো এমন একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে গাণিতিক কলাকৌশল প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান করা যায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সঠিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। যেসকল ক্ষেত্রে তথ্য পাওয়া যায় না, সেসব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংখ্যাত্মক তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ধাপ বা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। সংখ্যাত্মক তত্ত্বের ধাপগুলো নিম্নরূপ:

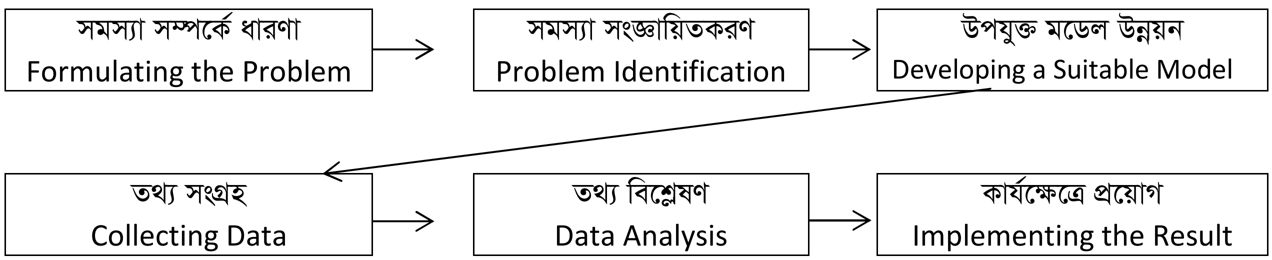

১. **সমস্যা সম্পর্কে ধারণা (Formulating the Problem):** সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে সমস্যাকে চিহ্নিত করা। সমস্যা চিহ্নিতকরণের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সফলতা বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে প্রকৃত সমস্যাটি নির্ধারণ করতে হবে।

২. **সমস্যা সংজ্ঞায়িত করা (Defining the Problem):** বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রকৃত সমস্যা সংজ্ঞায়িতকরণ করতে হবে। সিদ্ধান্তের বিভিন্ন চলক রয়েছে। এগুলো ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। একটি কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম পর্যালোচনা করতে হলে দেখতে হবে মানব সম্পদ দক্ষ কিনা, মেশিন ঠিকমতো কাজ করে কিনা, মেশিন আধুনিক ও মানসম্মত কিনা, মেশিনের চলমান শক্তি বৃদ্ধি করা যায় কিনা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে সমস্যা সংজ্ঞায়িতকরণ করতে হবে।

৩. **উপযুক্ত মডেল উন্নয়ন (Developing a suitable model):** গাণিতিক মডেল কতিপয় উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত একটি সেট যা সিস্টেমের কার্যকারিতা বর্ণনা করে। গাণিতিক মডেল সমস্যার প্রকৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। বিশেষ করে এ ক্ষেত্রে Linear Programming, Sensitivity Analysis গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিষ্ঠানের কোন্ সমস্যা কোন্ প্রোগ্রামের মাধ্যমে সমাধান করতে হবে তা বুঝে ব্যবস্থাপনাকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪. **তথ্যসংগ্রহ (Collection Data):** তথ্য সংগ্রহের কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনো তথ্য বাদ পড়ে না যায়। যদিও উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তবুও সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য নির্ভুল তথ্য প্রয়োজন। ভুল তথ্য দেওয়া হলে প্রতিষ্ঠান কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করতে ব্যর্থ হবে।

৫. **তথ্য বিশ্লেষণ (Data Analysis):** সিদ্ধান্ত গ্রহণের এ পর্যায়ে সম্ভাব্য সমস্যাসমূহের বিকল্প চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্য ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়। একটি সমস্যা সমাধানের অনেকগুলো বিকল্প পন্থা থাকতে পারে। সেগুলো থেকে উত্তম পন্থা গ্রহণ করতে হলে তথ্য বিশ্লেষণ করতে হবে।

৬. **কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ (Implementing the Result):** সিদ্ধান্ত গ্রহণের কার্যকর পন্থা বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রকার জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। এ জন্য মডেলটি পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের নীতির সাথে সম্পর্ক রেখে মূল্যায়ন করতে হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, উপর্যুক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি, অগ্রগতি বা সাফল্য অর্জন করা অত্যন্ত সহজ।

সংখ্যাত্মক মতবাদের বিভিন্ন রূপ

Various Modes of Quantitative Theory

সংখ্যাত্মক মতবাদের বিভিন্ন রূপসমূহ নীচে আলোচনা করা হলো:

অবদান	অবদানকারীগণের নাম
১. অপেক্ষমান তত্ত্ব	A. K. Erlang, L. C. Edic, P. M. Marse, M.G. Kendall
২. সিদ্ধান্ত তত্ত্ব	R. M. Thrall, C. I Bernad, H. A. Simon, N. Weiner
৩. রৈখিক তত্ত্ব	W. Leontiff, G. B. Danzig, P. A. Samuelson
৪. ক্রীড়াতত্ত্ব	J. Von, Newman, M. Shubik
৫. সিদ্ধান্ত তত্ত্ব	C. I. Bernard, R. M. Thrall, H. A. Simon, N. Weiner
৬. কিউয়িং তত্ত্ব	D. G. Rendall, Agner Krarup Erlany Leonard Kleinorck
৭. বিজ্ঞ পর্যালোচনা তত্ত্ব	Alex. F. Usborn

সিস্টেম মতবাদ

System Approach

সিস্টেম (system) শব্দটির অনেক অর্থ আছে, যেমন: আত্মনির্ভরশীল সেট, পারস্পরিক ক্রিয়াশীল উপাদান, কতকগুলো ইউনিটের সমষ্টি যা এমনভাবে সমন্বিত এবং সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করে যাদের উৎপাদন স্বাধীনভাবে কাজ করে এমন ইউনিটের চেয়ে অধিক। এ মতবাদ অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা সর্বদা চেষ্টা করে একটি সংগঠিত উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং পরস্পর বিভিন্ন অংশ সম্বলিত একটি সংগঠন তৈরি করতে। বিভিন্ন অংশ আলাদাভাবে কাজ করবে না, বরং একত্রে কাজ করবে। সিস্টেম অ্যাপ্রোচ অনুসরণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপকগণ একটি প্রতিষ্ঠানকে সার্বিকভাবে দেখার সুযোগ পায়। সংগঠন হলো বৃহৎ সিস্টেমের অংশ। যেমন: সংগঠন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বাস করে, অর্থনৈতিক সিস্টেমে থেকে কাজ করে এবং সমাজে এটি চালিত হয়। এইভাবে প্রতিষ্ঠান কাঁচামাল গ্রহণ করে প্রক্রিয়াকরণ করে এবং সমাজের নিকট তা রপ্তানি করে বা বিক্রি করে। S. P Robbins ও Coulter বলেন, "সিস্টেম হলো আন্ত:সম্পর্কিত ও আন্ত:নির্ভরশীল অংশের সমষ্টি এমনভাবে সাজানো হয়, যা একটি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া তৈরি করে। (A system is set of interrelated and interdepredent parts arranged in a manner that produces a unified whole.)

সিস্টেম দুই ধরনের। যেমন: (i) আবরিত সিস্টেম (Close System) এবং
(ii) খোলা সিস্টেম (Open System)

(i) আবরিত সিস্টেম (Close System): আবরিত সিস্টেম হলো এমন সিস্টেম হলো এমন সিস্টেম যা পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় না এবং পারস্পরিক ক্রিয়াশীল নয়।

(ii) খোলা সিস্টেম (Open System): খোলা সিস্টেম আবরিত সিস্টেমের বিপরীত। এটি পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং পারস্পরিক ক্রিয়াশীল।

প্রতিষ্ঠান হিসাবে যখন বিবেচনা করা হবে, তখন এটি হবে খোলা সিস্টেম। কারণ প্রতিষ্ঠান পরিবেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে চূড়ান্ত উৎপাদন করে তা পরিবেশেই বণ্টন করে। এটি পরিবেশের সাথেই পারস্পরিক ক্রিয়াশীল।

সিস্টেম মতবাদের মৌলিক ধারণা

Basic Concept of System Theory/Approach

ব্যবস্থাপনার সিস্টেম তত্ত্বটি কতগুলো মৌলিক ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এগুলো নিম্নরূপ:

১. **সমস্যা (Problem):** কাজ করার ক্ষেত্রে সমস্যা আসবেই। সিস্টেম বিশ্লেষণ করে সমস্যার উৎপত্তি অনুসন্ধান করতে হবে এবং তা সমাধানের পথ বলে দিতে হবে। কাজের ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে এ কথা বলার চেয়ে বরং বলতে হবে যে, এখানে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যার সমাধান করা উচিত।

২. **সিস্টেম (System):** সিস্টেম হচ্ছে উপাদানের সমষ্টি যা পরস্পর সম্পর্কিত, একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে কার্যসম্পাদন করে, যেভাবে কার্যসম্পাদন করা হলে সিস্টেমের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে।

৩. **লক্ষ্য অর্জন করা (To Achieve Goal):** একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যখন কোনো সিস্টেমের উপাদানগুলো সাবলীল ও সমন্বিতভাবে কাজ করে, তখন বুঝতে হবে যে, এই পদ্ধতি কোনো উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম। তাই সিস্টেমের উদ্দেশ্য চিহ্নিত করতে হবে এবং এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে হবে। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উপাদানগুলো হলো কর্মী, কাঁচামাল, বিপণন, অর্থ ও হিসাব।

৪. **ইনপুট (Input):** প্রতিটি সিস্টেমেরই একটি ইনপুট থাকে যা ব্যবহার করে আউটপুট পাওয়া যায়।

৫. **আউটপুট (Output):** প্রতিটি সিস্টেমের আউটপুট রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হলেই কেবল আউটপুটকে মূল্যায়ন করা হয়।

৬. **ফলাবর্তন (Feedback):** ফলাবর্তন হলো কোনো কার্যফলের প্রতিক্রিয়া। এটি নিশ্চিত করে যে, প্রতিষ্ঠান যা চায়, তা অর্জিত হয়েছে কিনা।

৭. **এনট্রপি (Entropy):** এনট্রপি হলো একটি মাপকাঠি যা দিয়ে সিস্টেমের গতিশীলতা পরিমাপ করা যায়। এটি ব্যবস্থাপনার তথ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এতে বলা হয় যে, যদি কোনো সিস্টেম অস্বাভাবিকতার দিকে ধাবিত হয়, তবে তা হলে উক্ত সিস্টেম প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জন করতে সক্ষম হবে।

৮. **সিনার্জি (Synergy):** সিনার্জি এর অর্থ হলো কোনো একক অংশের চেয়ে সমষ্টিগত অংশের ফলাফল ভালো। অর্থাৎ, ব্যক্তিক আচরণের চেয়ে দলগত আচরণ ব্যবস্থাপনার সহায়ক। কারণ, এককভাবে কোনো বিভাগ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে না। তেমনি কোনো সিস্টেমের কোনো অংশ এককভাবে কাজ করতে পারে না। তাই সমষ্টিগতভাবে কার্যসম্পাদন করতে হয়।

৯. **অভ্যন্তরীণ পরিবেশ (Internal Environment):** অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উপাদানগুলো সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত। তাই অভ্যন্তরীণ পরিবেশের কোনো উপাদান যদি সিস্টেমের কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে, তাহলে তা প্রয়োজনমত পরিবর্তন করা যায়।

১০. **বাহ্যিক পরিবেশ (External Environment):** সিস্টেমের বাহ্যিক পরিবেশ হচ্ছে পরিবেশের সেই অংশ যা, সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না কিন্তু সিস্টেমের কাজে প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণস্বরূপ: কর পদ্ধতির পরিবর্তন করা হলে প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদন নীতিরও পরিবর্তন করতে হবে। তা না হলে সিস্টেম কাজ করবে না।

১১. **উপ-পদ্ধতি (Subsystem):** একটি সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত স্বতন্ত্র অংশকে উপ-পদ্ধতি বলে। অন্যভাবে বলা যায়, একটি সিস্টেমের বিভিন্ন উপাদানের স্বকীয়তাকে উপ-পদ্ধতি বলে। উপ-পদ্ধতিগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ। কারণ, একটি পূর্ণাঙ্গ সিস্টেম উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উপ-পদ্ধতিগুলোর আন্ত:নির্ভরশীলতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১২. **সুপার সিস্টেম (Super System):** একাধিক পূর্ণাঙ্গ সিস্টেম নিয়ে কোনো সিস্টেম গঠিত হলে তাকে সিস্টেমসমূহ সুপার সিস্টেম বলা হয়। একটি সিস্টেম যেমন কতকগুলো উপ-সিস্টেম নিয়ে গঠিত হয়, তেমনি কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ সিস্টেম নিয়ে সুপার সিস্টেম গঠিত হয়।

১৩. **সিস্টেমের সীমা (System Boundary):** এক সিস্টেম থেকে অন্য সিস্টেমে প্রবাহের সীমাকেই সিস্টেমের সীমা বলা হয়। অর্থাৎ এক সিস্টেম থেকে অন্য সিস্টেমে যে পরিমাণ তথ্য প্রবেশাধিকার পায় তাই হচ্ছে সিস্টেমের সীমা। এক সিস্টেম থেকে অন্য সিস্টেমে মুক্তভাবে তথ্য প্রবাহিত হতে পারে।

১৪. **পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (Interdependence):** সিস্টেম মতবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- বিভিন্ন উপ-সিস্টেমের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা না থাকলে সিস্টেমের কার্যকারিতা থাকে না।

সিস্টেম মতবাদের বৈশিষ্ট্য

Characteristics of System Theory

১. **আন্ত:নির্ভরশীল অংশ (Inter-dependent Parts):** একটি সিস্টেমের অনেকগুলো অংশ থাকে, যার প্রতিটি অংশই গতিশীল এবং একে অপরের উপর নির্ভরশীল। কারণ, প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধ সম্পদ প্রতিটি সিস্টেমে ভাগ করে দেওয়া হয়। তারা পরস্পর নির্ভরশীল বলে সম্পদের অপচয় হয় না। একটি সংগঠনে বিভিন্ন ধরনের বিভাগ, উপ-বিভাগ থাকে। এগুলো আবার প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ফলে, একটি বিভাগের অংশের পরিবর্তন সংগঠনের অন্যান্য অংশের উপর প্রভাব ফেলে।

২. **সম্ভাব্যতা (Probabilistic):** ব্যবস্থাপনাকে নিয়ন্ত্রণবাদী মডেল ব্যবহার না করে সম্ভাব্যতাবাদী মডেল ব্যবহার করা উচিত। কেননা, নিয়ন্ত্রণবাদী মডেল ব্যবহার করা হলে সম্ভাব্য প্রকৃত ফলাফল জানা সম্ভব হয় না। ব্যবস্থাপনায় সবসময় সম্ভাব্য ফলাফল আশা করা হয় অনিশ্চয়তাকে নয়।

৩. **বহুস্তর এবং বহুমাত্রিক (Multi-level & Multi-dimensional):** সিস্টেম মতবাদ বহুস্তর এবং বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করে। এর ব্যস্টিক ও সামষ্টিক উভয়দিকই রয়েছে। ব্যস্টিক দিকে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো এবং সামষ্টিক দিকে প্রতিষ্ঠানের বাহিরের বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়।

৪. **বহুচলক (Multi-Variable):** ব্যবস্থাপনার এক সাথে অনেকগুলো চলক বিদ্যমান থাকে। কারণ একটিমাত্র উপাদান নিয়ে কোনো প্রক্রিয়া কাজ করে না। একটি প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য অনেকগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং নির্ভরশীল চলকের প্রয়োজন হয়। এতে ব্যবস্থাপনার কাজ জটিল আকার ধারণ করে। সিস্টেম মতবাদে ব্যবস্থাপনার এই জটিল প্রক্রিয়াটি বোঝা যায়।

৫. **বহুমাত্রিক (Multi-Disciplinary):** ব্যবস্থাপনায় হলো একটি বহুমাত্রিক বিষয়। এটি বিভিন্ন চিন্তাধারা থেকে জ্ঞান আহরণ করে। ব্যবস্থাপনা যে সকল জ্ঞান আহরণ করে সমন্বয় করে থাকে, সেগুলো হলো অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, গণিত, পরিসংখ্যান প্রভৃতি। এই সকল ক্ষেত্রে থেকে আহরিত জ্ঞানের সমন্বয়ে সিস্টেম মতবাদকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

সিস্টেমের উপ-সিস্টেমসমূহ

Sub-systems of an Organization or a System

প্রতিটি সংগঠনই হলো একিট সিস্টেম। একটি সিস্টেমের বিভিন্ন অংশই হচ্ছে সাব-সিস্টেম। অন্যভাবে বলা যায়, প্রতিষ্ঠানের সিস্টেমের যে স্তর থাকে, তাকে সাব-সিস্টেম বলে। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, কর্মপ্রক্রিয়া, গঠন কাঠামো এবং আচরণ থেকে আমরা প্রতিটি সাব-সিস্টেম বুঝতে পারি। একাধিক সাব-সিস্টেম নিয়ে একটি সিস্টেম গঠিত হয়, একই সাথে সিস্টেমগুলো সুপার সিস্টেমের অংশ। সাব-সিস্টেমগুলো আন্ত:নির্ভরশীলতার মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ সিস্টেম উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Holton & Jones সংগঠনের সিস্টেমে সাতটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, যথা- লক্ষ্য, সীমা, পরস্পর নির্ভরশীলতা, বাহ্যিক পরিবেশ, ইনপুট, আউটপুট এবং ফলাবর্তন। **Kast & Rosenzweig** সংগঠনে পাঁচটি সাব-সিস্টেমের পক্ষে মতামত প্রদান করেছেন। সাব-সিস্টেমগুলো হলো- লক্ষ্য ও মূল্যবোধ, মনস্তাত্ত্বিক সাব-সিস্টেম, কাঠামোগত সাব-সিস্টেম, কারিগরি সাব-সিস্টেম এবং ব্যবস্থাপনা সাব-সিস্টেম।

যাই হোক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যে ধরনের সাব-সিস্টেমগুলো দেখা যায়, নিম্নরূপঃ

১. **লক্ষ্য ও মূল্যবোধ উপ-সিস্টেম (Goals and Values Subsystems):** প্রতিষ্ঠানে যে সকল উপ-সিস্টেম থাকে, লক্ষ্য ও মূল্যবোধ তাদের মধ্যে একটি। সমাজের মূল্যবোধ থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের জন্য যে উপ-সিস্টেমে তৈরি হয়, তা-ই লক্ষ্য ও মূল্যবোধ উপ-সিস্টেম।

২. **মনস্তাত্ত্বিক উপ-সিস্টেম (Psychological Subsystems):**মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলো নিয়ে যে উপ-সিস্টেম চালু করা হয়, তা-ই মনস্তাত্ত্বিক উপ-সিস্টেম। যেমন: কাজের প্রতি কর্মীর আগ্রহ, মনোভাব, আচরণ এবং দলীয় চেতনা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৩. **সামাজিক উপ-সিস্টেম (Social Subsystems)**: প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের আচরণ সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা এবং কর্মপরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে কর্মীদের ব্যক্তিক এবং দলগত সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটায়। একটি অনানুষ্ঠানিক সংগঠন হিসাবে সামাজিক উপ-সিস্টেম প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ঘটায়। একটি অনানুষ্ঠানিক সংগঠন হিসাবে সামাজিক উপ-সিস্টেম প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কর্মীদের আবেগ, বিশ্বাস এবং আগ্রহের জন্য এবং সামাজিক জীব হিসাবে সমাজের স্বীকৃতি প্রভৃতি সামাজিক উপ-সিস্টেমের উপাদান।

৪. **কাঠামোগত উপ-সিস্টেম (Structural Subsystems)**: কাঠামোগত স্থাপনা যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের মেরুদণ্ডস্বরূপ। কাঠামোগত উপ-সিস্টেম আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠানের জন্য শক্তি সরবরাহ করে। অর্থাৎ, উদ্দেশ্যার্জনের জন্য যা প্রয়োজন সবই এ উপ-সিস্টেমের মাধ্যমে দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষের ক্রমবিন্যাস প্রতিষ্ঠানের কাঠামো অনুসারে সাজানো হয়। কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তা কাজে বাস্তবায়িত হয়। সুতরাং কাঠামোগত উপ-সিস্টেম একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যসম্পাদন এবং উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

৫. **কারিগরি উপ-সিস্টেম (Technology Subsystems)**: কারিগরি উপ-সিস্টেম প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের সাথে জড়িত। কারিগরি উপ-সিস্টেম সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক উপ-সিস্টেমের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কর্মীর আচরণ যদি সন্তোষজনক হয় তাহলে কারিগরি উপ-সিস্টেম কার্যকরভাবে কাজ করে। কারিগরি উপ-সিস্টেমের সাথে প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যিক ক্ষেত্রগুলো জড়িত। যেমন: উৎপাদন, বিক্রয়, অর্থায়ন এবং কর্মী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

৬. **৬. ব্যবস্থাপনা উপ-সিস্টেম (Management Subsystems)**: ব্যবস্থাপনা উপ-সিস্টেমের ব্যপ্তি সমগ্র প্রতিষ্ঠান জুড়ে। প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাজের নীতি, কর্মপ্রবাহ, ব্যবস্থাপনার কাঠামো, যোগাযোগ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মী প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন, সিদ্ধান্ত এবং নিয়ন্ত্রণসহ সকল কাজ ব্যবস্থাপনা উপ-সিস্টেমের অন্তর্গত।

৭. **ক্ষমতা উপ-সিস্টেম (Power Subsystems)**: অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করার সক্ষমতাকে ক্ষমতা বলে। ক্ষমতার বলে অন্যের আচরণকে প্রভাবিত করে নিজের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করা যায়। কাঠামো উপ-সিস্টেমে ক্ষমতার প্রবাহ উল্লেখ করা থাকে। নির্বাহীরা প্রয়োজনানুযায়ী তা ব্যবহার করেন।

৮. **কর্ম উপ-সিস্টেম (Tasks Subsystems)**:প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যকে অনেকগুলো উপবিভাগে ভাগ করা হয় এবং সে মোতাবেক কর্মীদেরকে কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রতিটি উপবিভাগ তাদের নির্ধারিত কাজ সম্পাদন করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।

৯. **বাহ্যিক ইন্টারফেস উপ-সিস্টেম (External Interface Subsystems)**: এর অর্থ হলো- প্রতিষ্ঠানের বাহিরের বড় একটি পরিবেশ রয়েছে যা প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করে। জনসংযোগ, কর্মী ব্রান্ডিং, বিজ্ঞাপন, সিএসআর (Corporate Social Responsibility) প্রভৃতি। এগুলো প্রতিষ্ঠানের ইমেজ তৈরিতে সাহায্য করে।

১০. **কর্মী উপ-সিস্টেম (People Subsystems)**:কর্মী উপ-সিস্টেমের সাথে সংশ্লিষ্টরা হলো হলো- প্রতিষ্ঠানের কর্মী, তাদের কাজের সম্পর্ক, কর্তৃপক্ষের ধরন, ব্যবস্থাপনার ধরন এবং তথ্য যোগাযোগ কাঠামো প্রভৃতি।

১১. **সংরক্ষণ উপ-সিস্টেম (Maintenance Subsystems)**: সংরক্ষণ উপ-সিস্টেম প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সামাজিকভাবে জড়িত করে। পারিতোষিক ও সুবিধাসমূহ প্রদান করার ফলে কর্মীদের মধ্যে প্রণোদনার সৃষ্টি হয়, কার্যপরিবেশের উন্নয়ন ঘটে, ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং অন্যান্য চাহিদা পূরণ হয় বিধায় তারা দলগতভাবে কাজ করে। সংরক্ষণ বলতে প্রতিষ্ঠানে কর্মীদেরকে ধরে রাখার জন্য গৃহীত ব্যবস্থাসমূহকে বুঝায়। যেমন: বেতন ও মজুরি, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম, প্রদেয় সুবিধাসমূহ, বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি।

১২. **অভিযোজন উপ-সিস্টেম (Adaptive Subsystems)**: ব্যবসায়িক পরিবেশ সবসময়ই পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠান যেন নিজেকে মানিয়ে নিয়ে কাজ করতে পারে সেজন্য এ উপ-সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান কার্যপরিবেশের সমস্যা এবং সম্ভাবনার তথ্যসংগ্রহ করে নতুনত্বের প্রবর্তন করে, যা প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করতে পারে। প্রতিষ্ঠানের গবেষণাগারে অথবা পণ্যের মানোন্নয়ন বিভাগ এই উপ-সিস্টেমের অংশ হয়ে কাজ করতে পারে।

সিস্টেম এবং উপ-সিস্টেমের উপর প্রভাববিস্তারকারী উপাদান

Factors Influencing the System and Sub-systems

একটি সিস্টেম এবং উপ-সিস্টেমের উপর প্রভাব বিস্তারকারী অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উপাদানসমূহ রয়েছে। নীচে এ সকল প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ বর্ণনা করা হলো:

১. **উন্মুক্ত বনাম আবদ্ধ (Open Vs Close System):** উন্মুক্ত পদ্ধতিতে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় ধরনের পরিবেশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা সহজ হয়। কিন্তু আবদ্ধ পদ্ধতিতে তা সম্ভব হয় না। এতে বাহ্যিক উপাদানের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তাই ব্যবস্থাপনাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, কোন পদ্ধতিতে তারা কাজ করবে।

২. **লক্ষ্যার্জনমুখীতা (Goal Seeking):** একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যখন কোনো সিস্টেমের উপাদানগুলো সমন্বিতভাবে কাজ করে, তখন বুঝা যায় যে, এটি কোন ধরনের উদ্দেশ্য অর্জন করতে চায়। এমতাবস্থায়, নতুন কোনো সিস্টেমের উদ্দেশ্য চিহ্নিত করে এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে হবে। অর্থাৎ, সিস্টেম হতে হবে লক্ষ্যার্জনমুখী।

৩. **এন্ট্রপি (Entropy):** এন্ট্রপি হলো একটি মাপকাঠি যা দিয়ে সিস্টেমের গতিশীলতা পরিমাপ করা যায়। এটি ব্যবস্থাপনার তথ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এতে বলা হয় যে, যদি কোনো সিস্টেম অস্বাভাবিকতার দিকে ধাবিত হয়, তবে তা হলে উক্ত সিস্টেম প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জন করতে সক্ষম হবে।

৪. **সিনার্জি (Synergy):** সিনার্জি এর অর্থ হলো কোনো একক অংশের চেয়ে সমষ্টিগত অংশের ফলাফল ভালো। অর্থাৎ, ব্যক্তিক আচরণের চেয়ে ফলগত আচরণ ব্যবস্থাপনার সহায়ক। কারণ, এককভাবে কোনো বিভাগ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে না। তেমনি কোনো সিস্টেমের কোনো অংশ এককভাবে কাজ করতে পারে না। তাই সমষ্টিগতভাবে কার্যসম্পাদন করতে হয়।

৫. **উপ-পদ্ধতি (Sub system):** একটি সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত স্বতন্ত্র অংশকে উপ-পদ্ধতি বলে। অন্যভাবে বলা যায়, একটি সিস্টেমের বিভিন্ন উপাদানের স্বকীয়তাকে উপ-পদ্ধতি বলে। উপ-পদ্ধতিগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ। কারণ একটি পূর্ণাঙ্গ সিস্টেম উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উপ-পদ্ধতিগুলোর আন্ত:নির্ভরশীলতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬. **সুপার সিস্টেম (Super System):** একাধিক পূর্ণাঙ্গ সিস্টেম নিয়ে কোনো সিস্টেম গঠিত হলে তাকে সিস্টেমসমূহের সুপার সিস্টেম বলা হয়। একটি সিস্টেম যেমন কতকগুলো উপ-সিস্টেম নিয়ে গঠিত হয়, তেমনি কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ সিস্টেম নিয়ে সুপার সিস্টেম গঠিত হয়।

৭. **সিস্টেমের সীমা (System Boundary):** এক সিস্টেম থেকে অন্য সিস্টেমে প্রবাহের সীমাকেই সিস্টেমের সীমা বলা হয়। অর্থাৎ এক সিস্টেম থেকে অন্য সিস্টেমে যে পরিমাণ তথ্য প্রবেশাধিকার পায় তাই হচ্ছে সিস্টেমের সীমা। এক সিস্টেম থেকে অন্য সিস্টেমে মুক্তভাবে তথ্য প্রবাহিত হতে পারে।

৮. **পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (Interdependence):** সিস্টেম মতবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- বিভিন্ন উপ-সিস্টেমের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা না থাকলে সিস্টেমের কার্যকারিতা থাকে না।

৯. **কাঠামো (Structure):** সিস্টেম এবং উপ-সিস্টেমের উপর প্রভাব বিস্তারকারী অন্য আর একটি উপাদান হলো সংগঠন কাঠামো। কেননা, সাংগঠনিক কাঠামো সিস্টেম এবং উপ-সিস্টেমের নির্ভরশীলতার ভিত্তি প্রদান করে।

১০. **প্রযুক্তি (Technology):** বর্তমানে ব্যবস্থাপনা অনেক বেশি প্রযুক্তিনির্ভর। ফলে সিস্টেম এবং উপ-সিস্টেমের উপর প্রযুক্তির প্রভাব খুব বেশি। বর্তমান সময়ে প্রযুক্তি জানা না থাকলে প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়।

সিস্টেমের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা

Importance/Necessity of a System

সিস্টেমের মাধ্যমে যে-কোনো কাজ সুসংহত ও সর্বজনীনভাবে সম্পাদন করা যায়। যাহোক, সিস্টেম মতবাদের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব নীচে আলোচনা করা হলো:

১. **একত্রীকরণ (Integration):** সিস্টেম মতবাদ বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ পরিবেশ থেকে সংগৃহীত তথ্য সমন্বিত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামো তৈরি করে। সংগৃহীত সকল তথ্যের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তা অনেক বেশি বাস্তবসম্মত ও ফলপ্রসূ হয়।

২. **উন্মুক্ত সিস্টেম (Open System):** প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি বিভাগ পারস্পরিক নির্ভরশীল। একে অপরের সহযোগিতা ব্যতীত প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জিত হয় না। সিস্টেম প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ এবং ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটায়। এর মাধ্যমে কেবল অভ্যন্তরীণ সম্পর্কেরই উন্নয়ন হয় না, বাহ্যিক সম্পর্কের ওপরও প্রভাব পড়ে। এমতাবস্থায়, প্রতিটি সংগঠনকে একটি উন্মুক্ত সিস্টেম হিসাবে বিবেচনা করা হয়। একটি প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান বিভাগগুলো যখন সমানভাবে কাজ করতে সম্মত হয় এবং ভূমিকা রাখতে পারে, তখন তাকে সাংগঠনিক উন্নয়ন বলে।

৩. **সাংগঠনিক উন্নয়ন (Organizational Development):** একটি প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, অর্থ, মানবসম্পদ ও হিসাব বিভাগসহ বিভিন্ন ধরনের বিভাগ থাকে। প্রতিটি বিভাগের মূল লক্ষ্য হলো- প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধি করা। বিভাগগুলো পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে এবং সমন্বিতভাবে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের প্রয়াস চালায়। এদের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। সিস্টেম মতবাদের মূল লক্ষ্যই হলো ব্যবস্থাপনার সাথে কর্মী, যন্ত্রপাতি, অর্থ, ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি উপাগুলোর সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি করা।

৪. **উপযুক্ত সমাধান (Proper Solution):** যে কোনো সমস্যার একাধিক বিকল্প সমাধান থাকতে পারে। সিস্টেমের সাহায্যে সমস্যার উপযুক্ত সমাধান খুঁজে বের করা সহজ হয়। কেননা, সিস্টেম যে কোনো সমস্যার কারণ খুঁজে বের করে তা সমাধানের জন্য সচেষ্ট হয়।

৫. **সহজ রূপান্তর (Simple Transformation):** সিস্টেম মতবাদের কাজগুলো ব্যবস্থাপনার জটিল সমস্যাকে সহজ এবং স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে। প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সিস্টেম মতবাদ বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়ের ব্যবস্থা করে। ফলে কমী, যন্ত্রপাতি, অর্থ, ক্রয়-বিক্রয়, উৎপাদন এবং বাজার গবেষণাসহ কাজে কার্যকরভাবে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

৬. **উদ্দেশ্যের প্রতিফলন (Reflection of Objectives):** সিস্টেম মতবাদে উদ্দেশ্যের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সকল পক্ষ বুঝতে পারে যে, গ্রাহকদের উন্নতমানের পণ্য বা সেবা সরবরাহের জন্য বা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি কাজ গুরুত্বপূর্ণ। এতে সকল পক্ষের উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জন সহজ হয়।

সিস্টেম তত্ত্বের সমালোচনা

Criticism of System Theory

সিস্টেম মতবাদের অনেক ভালো দিক রয়েছে। তবে এর কিছু সমালোচনাও রয়েছে। নীচে সিস্টেম মতবাদের সমালোচনাগুলো উল্লেখ করা হলো:

১. **জটিল পদ্ধতি (Complex System):** সিস্টেম মতবাদ একটি জটিল পদ্ধতি এবং বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা আরও বেশি জটিল। কেননা, বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে এমনিতেই অনেক বেশি বিভাগ-উপবিভাগ থাকে, সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা কঠিন। আবার যদি বিভিন্ন তথ্যের সন্নিবেশ ঘটাতে হয়, তাহলে তা জটিলতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

২. **নিজস্ব বিবেচনা (Self Consideration):** সিস্টেম মতবাদে নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনার উপর ভিত্তি করে সংগৃহীত তথ্যের সমন্বয় সাধন করা হয়। বিজ্ঞানসম্মত কোনো প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি এখানে অনুসরণ করা হয় না। এতে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন অনেক ক্ষেত্রেই বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

৩. **নির্ভরশীলতা (Dependency):** এই মতবাদে বিভিন্ন বিভাগ এবং উপবিভাগের উপাদানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু উপাদানসমূহের নির্ভরতার মাত্রা পরিমাপের জন্য কোনো উপায় সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়নি।

৪. **সার্বজনীনতা (Universality):** সিস্টেমের বিভিন্ন উপ-সিস্টেমের উপাদানসমূহের মধ্যে পার্থক্য থাকে। এতে বিভিন্ন উপ-সিস্টেমের মধ্যে সর্বজনীন কোনো নির্ভরশীলতা স্থাপন করা সম্ভব হয় না।

৫. **আচরণগত ধারণা (Behavioural Concept):** পরিমাণগত সিস্টেম মতবাদ কাজ করতে পারে না। কারণ, কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের আচরণ গাণিতিকভাবে পরিমাপ করা যায় না। কিন্তু ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কর্মী এবং ব্যবস্থাপনা উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৬. **বর্জন করা (Ignor):** সিস্টেম মতবাদে একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর প্রয়োজন অনুপাতে সংগৃহীত তথ্য গ্রহণ বা বর্জন করা হয়। নির্দিষ্ট কাজের সাথে সম্পর্কবিহীন তথ্যের বৈশিষ্ট্য অন্য কোনো কাজে সহায়তা করতে পারে যা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভালো নাও হতে পারে।

সিস্টেম তত্ত্বের ভালো দিক
Merits of Systems Theory

সিস্টেম তত্ত্ব বা মতবাদ আধুনিক সাংগঠনিক মতবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব বা মতবাদ। এ মতবাদ বা তত্ত্বের প্রবক্তারা বিভিন্ন অংশের সমন্বিত চিন্তাভাবনার উপর গুরুত্বারোপ করে থাকেন। নিম্নে সিস্টেম তত্ত্বের ভালো দিকগুলো উপস্থাপন করা হলো:

১. **উৎসাহদান (To Motivate):** সিস্টেম তত্ত্ব অনুযায়ী সংগঠন এবং বাহ্যিক পরিবেশের মধ্যে আন্ত:ক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হয়। ফলে ব্যবস্থাপনা ও কর্মীবৃন্দ কার্যসম্পাদনে উৎসাহিত হয়।

২. **উদ্দেশ্যের উপর আলোকপাত (Highlight on Objectives):** এ তত্ত্বে সাময়িকভাবে সিস্টেমের উদ্দেশ্যের উপর আলোকপাত করে ফলে সকল অংশের উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব হয়।

৩. **সমন্বয় সাধন (Coordination):** সিস্টেম তত্ত্বে সংগঠনকে একটি সেট হিসাবে বিবেচনা করে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সমন্বয়সাধনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ফলে সাংগঠনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভবপর হয়।

৪. **সাংগঠনিক উন্নয়ন (Organizational Development):** সিস্টেম তত্ত্বে সাংগঠনিক কাঠামো উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের ধরন, যোগাযোগ ও কার্য প্রবাহের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতে সহজে সাংগঠনিক নকশা প্রণয়ন সম্ভব হয়।

৫. **আন্ত:শাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞান আহরণ (To Gather Knowledge from Different Subjects):** সিস্টেম তত্ত্ব আধুনিক মতবাদের জ্ঞান অর্জনের বহুবিধ শাখা হতে তথ্য ও অভিজ্ঞতা লাভ করে। তা ছাড়া সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি, পরিসংখ্যান ইত্যাদি বিষয় সিস্টেম মতবাদে যুক্ত করা হয়। ফলে এ তত্ত্ব প্রয়োগ করে আন্ত:শাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভবপর হয়।

৬. **সমৃদ্ধি অর্জন (Achieving Riches):** এ তত্ত্বে ধারণা করা হয় সংগঠন একটি উপযুক্ত সিস্টেম। তাই সংগঠনের সমস্যা সার্বিকভাবে সমাধান করে সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভবপর হয়।

৭. **উপযুক্ত সমাধান (Proper Solution):** সিস্টেম তত্ত্বে আন্ত:বিশেষজ্ঞ দল ব্যবহার করে গবেষণার মাধ্যমে কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবনের কথা বলা হয়েছে। ফলে সংগঠনের যে-কোনো সমস্যার উপযুক্ত সমাধান দেওয়া এবং লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভবপর হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, সফলতা অর্জনের জন্য সংগঠনকে সিস্টেম হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। তাই স্পষ্টত বলা যায়, সাংগঠনিক সফলতা অর্জনে সিস্টেম তত্ত্বের মূল্যবান অবদান রয়েছে।

ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সিস্টেম বিজ্ঞানীদের অবদান
Contribution of System Scientists in the Development of Management

সিস্টেম বিজ্ঞানীদের ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। সিস্টেম বিজ্ঞানীগণ সংখ্যাত্মক কৌশলের উন্নয়ন করেন। ব্যবস্থাপনার জ্ঞানচর্চায় মিশ্র দলের ব্যবহার এবং কর্মকাণ্ডে গবেষণার মাধ্যমে সমাধান বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে

উল্লেখযোগ্য অবদান। ৩১২ খ্রি. যখন রোমক আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আর্কিমিডিসকে দায়িত্ব দেওয়া হয় তখন থেকে সংখ্যাত্মক কৌশল প্রয়োগের প্রয়াস প্রথম লক্ষ্য করা যায়। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এটি প্রথমে প্রয়োগ করেন এফ.ডব্লিউ টেইলর। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ডেনিস গণিতশাস্ত্রবিদ এ. কে আরলং বিভিন্ন কারিগরি সমস্যা সমাধানে সংখ্যাত্মক কৌশল প্রয়োগ করেন। মজুদ মাল নিয়ন্ত্রণের জন্য এফ ডব্লিউ হ্যারিস অর্থনৈতিক পরিমাণ আয়তন মডেল ব্যাখ্যা করেন। সামরিক ক্ষেত্রে কর্মকাণ্ড গবেষণার প্রথম সাফল্যজনক ব্যবহার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় লক্ষ্য করা যায়। এফ ডব্লিউ ল্যাকেস্টার সমীকরণ প্রদান করেন যা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ জয়ের কৌশল বর্ণনা করে। টমাস আলভা এডিসন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সাবমেরিন বিরোধী নয়া কৌশল উন্নয়ন করেন।

যাই হোক, অনেক বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখেন। নীচে সিস্টেম বিজ্ঞানীদের অবদানের সারসংক্ষেপ:

কৌশল	অবদানকারী	প্রয়োগক্ষেত্র
১. সিদ্ধান্ত তত্ত্ব	আর. এম. ফ্রল, ডব্লিউ. এডওয়ার্ডস, সি. আই. বার্নার্ড, সি. হিচ, জে এ্যারো, সি. ডব্লিউ, চার্চম্যান, এইচ. এ. সাইমন, এন ওয়েনার।	প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নির্ধারণ, আন্তঃব্যক্তিক দ্বন্দ্ব এবং আন্তঃক্রিয়া মূল্যায়ন, কার্যসম্পাদন মূল্যায়ন হিসাব, সংগঠন বিশ্লেষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত তত্ত্বের প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।
২. পরীক্ষামূলক নকশা	আর. এ. ফিশার, ডব্লিউ. জি. কোচরান, জি. এম ককস, এস. জি. ফেনডাল।	পরীক্ষামূলক নকশা কৌশল প্রয়োগ যে-কোনো ভবিষ্যৎ মডেল তৈরি করার মৌল উপাদান।
৩. ক্রীড়া তত্ত্ব	জে. ভন নিউম্যান, মরগেনস্টার্ন, এম. শুরিক	প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সময় ও মূল্য নির্ধারণ, সামরিক স্ট্র্যাটেজি।
৪. তথ্য সংক্রান্ত তত্ত্ব	সি. শ্যানন, এস গোল্ডম্যান, ডব্লিউ উইবার।	তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, নকশা, সংগঠন, বিশ্লেষণ, বাজার গবেষণায় বিজ্ঞাপনের কার্যকারিতা।
৫. মজুত মাল নিয়ন্ত্রণ	এফ. ডব্লিউ. হ্যাবিস, টি. ডব্লিউ. হোইটিন, এফ ম্যাগি কে. জে. অ্যারো, টি. হ্যাবিস।	মিতব্যয়ী ক্রয় পরিমাণ এবং মজুত মাল নিয়ন্ত্রণ।
৬. নমুনায়ন তত্ত্ব	ডব্লিউ. ই. ডেমিং, আইচ. এফ. জজ, এইচ. জি. রমিগ।	গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, সহজ ব্যয় হিসাবরক্ষণ ও হিসাব নিরীক্ষা, বাজার গবেষেণায় ভাগ্য পণ্যের জরিপ এবং উৎপাদন যাচাই।
৭. অনুকরণ তত্ত্ব	সি. জে টমাস, ডব্লিউ. এল. ডিমার, আর. ই. জিমারম্যান।	ব্যবস্থাপনা বিশ্বস্ততা মূল্যায়ন, লাভ পরিকল্পনা, সরবরাহ ব্যবসায়।
৮. পরিসংখ্যান সিদ্ধান্ত তত্ত্ব	এ. ওয়ার্ল্ড, ই. সি. মলিনা, ও. এল. জাডিস, ওব্লু এ শিয়োহার্ন্ট।	সম্ভাব্যতা মডেল পরিমাপকের হিসাব।
৯. প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা	ইজ. বুল, এ. এন হোয়াইটহেড, বি. রাসেল	চক্রাকার (**Circuit**) নকশা, আইনানুগ অনুমান যেমন: চুক্তির সংগতি পরীক্ষা।
১০. সম্ভাব্য তত্ত্ব	আর. এ. ফিশার, টি. সি. ফ্রাই, ডব্লিউ ফেলার, এইচ ক্র্যামার	সম্ভাব্যতা তত্ত্ব সকল প্রয়োগ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
১১. অপেক্ষাময় তত্ত্ব	আর. এ. ফিশার, টি. সি. ফ্রাই, ডব্লিউ ফেলার, এইচ ক্র্যামার	মজুত মাল নিয়ন্ত্রণ, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রক, টেলিফোন তারবার্তা ব্যবস্থা, ক্লিনিকে রোগির তালিকা প্রণয়ন, বেতার যোগাযোগ ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, সংখ্যাত্মক কৌশল, সামরিক ক্ষেত্রে অকেজো যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সিস্টেম বিজ্ঞাপনের অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ সংখ্যাত্মক বা পরিমাণগত মতবাদ ও সিস্টেম মতবাদ সম্পর্কে খাতায় বর্ণনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার পরিমাণগত বা গণিত বিষয়াসমূহ অতি পুরাতন। সেনাবাহিনী প্রশাসনে এটির ব্যবহার দীর্ঘদিনের। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কার্য গবেষণায় এটি (Operation Research) ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ব্যবসায় বা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এর ব্যবহার খুবই সাম্প্রতিক। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্যবহৃত হয়। এটিকে গাণিতিক মতবাদ, কার্য গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিমাণগত কৌশল এবং গাণিতিক গণনা পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গাণিতিক প্রক্রিয়া, ধারণা, সাংকেতিক চিহ্ন, মডেল ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। সংখ্যাত্মক মতবাদের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন: ১. সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ ২.কম্পিউটারের ব্যবহার ৩. লক্ষ্যার্জন ৪. মডেল ৫. সামঞ্জস্য। সংখ্যাত্মক তত্ত্বের সুবিধার পাশাপাশি অনেক সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। যেমন: ১. দ্বন্দ্ব গ্রহণযোগ্যতার অভাব ২. সংখ্যাত্মক বিশ্লেষণ ৩. ব্যয় বৃদ্ধি ৪. অনুমাননির্ভর ৪. মনোবৈজ্ঞানিক বিষয়। সংখ্যাত্মক মতবাদ হলো এমন একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে গাণিতিক কলাকৌশল প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান করা যায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সঠিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। যেসকল ক্ষেত্রে তথ্য পাওয়া যায় না, সেসব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংখ্যাত্মক তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে কতিপয় ধাপ রয়েছে, যেমন: সমস্যা সম্পর্কে ধারণা, সমস্যা সংজ্ঞায়িত করা, উপযুক্ত মডেল উন্নয়ন, তথ্যসংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ। সিস্টেম (system) শব্দটির অনেক অর্থ আছে, যেমন: আত্মনির্ভরশীল সেট, পারস্পরিক ক্রিয়াশীল উপাদান, কতগুলো ইউনিটের সমষ্টি যা এমনভাবে সমন্বিত এবং সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করে যাদের উৎপাদন স্বাধীনভাবে কাজ করে এমন ইউনিটের চেয়ে অধিক। এ মতবাদ অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা সর্বদা চেষ্টা করে একটি সংগঠিত উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং পরস্পর বিভিন্ন অংশ সম্বলিত একটি সংগঠন তৈরি করতে। বিভিন্ন অংশ আলাদাভাবে কাজ করবে না, বরং একত্রে কাজ করবে। সিস্টেম এ্যাপ্রোচ অনুসরণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপকগণ একটি প্রতিষ্ঠানকে সার্বিকভাবে দেখার সুযোগ পায়। সংগঠন হলো বৃহৎ সিস্টেমের অংশ। যেমন: সংগঠন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বাস করে, অর্থনৈতিক সিস্টেমে থেকে কাজ করে এবং সমাজে এটি চালিত হয়। এভাবে প্রতিষ্ঠান কাঁচামাল গ্রহণ করে প্রক্রিয়াকরণ করে এবং সমাজের নিকট তা রপ্তানী করে বা বিক্রি করে। S. P Robbins ও Coulter বলেন, "সিস্টেম হলো আন্ত:সম্পর্কিত ও অন্ত:নির্ভরশীল অংশের সমষ্টি এমনভাবে সাজানো হয়, যা একটি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া তৈরি করে। সিস্টেম দুই ধরনের। যেমন: (i) আবরিত সিস্টেম ও (ii) খোলা সিস্টেম। (i) আবরিত সিস্টেম। আবরিত সিস্টেম হলো এমন সিস্টেম যা পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় না এবং পারস্পরিক ক্রিয়াশীল নয়। (ii) খোলা সিস্টেম: খোলা সিস্টেম আবরিত সিস্টেমের বিপরীত। এটি পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং পারস্পরিক ক্রিয়াশীল। প্রতিটি সংগঠনই একটি সিস্টেম। একটি প্রতিষ্ঠানে অনেকগুলো সাব-সিস্টেম থাকতে পারে, যেমন: ১. লক্ষ্য ও মূল্যবোধ উপ-সিস্টেম ২. মনস্তাত্ত্বিক উপ-সিস্টেম ৩. সামাজিক উপ-সিস্টেম ৪. কাঠামোগত উপ-সিস্টেম ৫. কারিগরি উপ-সিস্টেম ৬. ব্যবস্থাপনা উপ-সিস্টেম ৭. ক্ষমতা উপ-সিস্টেম ৮. কর্ম উপ-সিস্টেম ৯. বাহ্যিক ইন্টারফেস উপ-সিস্টেম ১০. কর্মী উপ-সিস্টেম ১১. সংরক্ষণ উপ-সিস্টেম ১২. অভিযোজন উপ-সিস্টেম।

পাঠ-৪.৫ সাপেক্ষ তত্ত্ব; ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব জঙ্গল

Contingency or Situation Approach; The Management Theory Jugle

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সাপেক্ষতা তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব জঙ্গল বর্ণনা করতে পারবেন।

পরিস্থিতি বা বিকল্প অ্যাপ্রোচ বা সাপেক্ষতা তত্ত্ব

Contingency or Situation Approach

পরিস্থিতি বা বিকল্প বলতে বুঝায় প্রয়োজনানুযায়ী বিকল্প কার্যসমূহ গ্রহণ করা। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিস্থিতিমূলক বা বিকল্প এর অর্থ হলো সকল পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য কোনো একক পদ্ধতিই ফলপ্রসূ নয় এবং ব্যবস্থাপকগণ এ ক্ষেত্রে কার্যসম্পাদনে যে-কোনো পন্থা ব্যবহারের জন্য স্বাধীন হন। এ মতবাদ অনুসারে ব্যবস্থাপনায় গতানুগতিক নীতি প্রয়োগ থেকে আধুনিক ধারায় পরিস্থিতি মোকাবিলায় তা অপর্যাপ্ত বলে মনে করেন। পরিস্থিতি অ্যাপ্রোচ প্রবর্তনকারীদের মূল ধারণা হলো প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তির প্রকৃতি, প্রতিষ্ঠানের আকার, আইনগত ব্যবস্থা, বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য উপাদান যা প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তিতে অসুবিধার সৃষ্টি করে, এগুলোকে সাংগঠনিক কাঠামোর সাথে সংগতিবিধান করতে হবে।

Kast এবং **Rosenweig** এর মতে, "সাপেক্ষ মতবাদ বিভিন্ন সাব-সিস্টেমের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক সংগঠন ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করে এবং বিশেষ উপাদানগুলোর মধ্যকার সম্পর্কের প্যাটার্ন বর্ণনা করে থাকে। এটি সংগঠনের বিভিন্নমুখী প্রকৃতির উপর গুরুত্বারোপ করে এবং বিশেষ পরিস্থিতি ও বৈচিত্র্য নয় পারিপার্শ্বিক সংগঠন কীভাবে পরিচালিত হয়, তা ব্যাখ্যা করে।"

F. Luthans এর মতে, "যে ধারণা অনুযায়ী সঠিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম কোনো ব্যবসার নির্দিষ্ট সুবিচারের উপর করে তাকে পরিস্থিতি প্রেক্ষিত তত্ত্ব বলে।"

Bove ও তার সহযোগীদের মন্তব্য হলো, "পরিস্থিতিনির্ভর মতবাদ হলো ব্যবস্থাপনা এমন একটি মতবাদ বা সংগঠনের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ব্যবস্থাপনা কলাকৌশল গ্রহণের উপর জোর দেয়। "

জোহান উডওয়ার্ড (John Woodward) হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ব্যবস্থাপনায় পরিস্থিতি বা বিকল্প অ্যাপ্রোচ প্রবর্তন করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি (স্ত্রী) তার গবেষণাপত্র "প্রযুক্তি ও সংগঠন" (Technology & Organization) প্রকাশ করেন যা এ অ্যাপ্রোচের মূল প্রতিপাদ্য হিসাবে পরিগণিত। অন্যান্য বিখ্যাত অবদানকারীগণ হলেন জি,এম,স্টেলকার (G. M. Stalker), পল লরেন্স (Paul Lawrence), জেমস ডি, থম্পমন (James D. Thomson) প্রমুখ। পরিস্থিতি বা বিকল্প অ্যাপ্রোচটি বর্তমান সময়ে সংগঠনের সংকট মোকাবিলার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান যার বহুমুখী শৃঙ্খলা রয়েছে। এটি বয়সের দিক থেকে ছোটো বা যৌবনপ্রাপ্ত। বহুমুখী শৃঙ্খলার ক্ষেত্রগুলো হলো অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, জনপ্রশাসন, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও নৃ-বিজ্ঞান প্রভৃতি। ব্যবস্থাপনার অ্যাপ্রোচগুলো বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যথাযোগ্য মনে হলেও ব্যবস্থাপনার মূল তত্ত্বগুলো একই রকম।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, কোনো ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন উপাদান ও কৌশলের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারের অধিক কার্যকরী ফলাফল নির্ণয়ের প্রক্রিয়াকে সাপেক্ষ তত্ত্ব বলে।

সাপেক্ষতা তত্ত্ব বা পরিস্থিতি নির্ভর তত্ত্বের ইতিহাস

History of Development of Contingency Theory

আধুনিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্বগুলোর মধ্যে পরিস্থিতি নির্ভর তত্ত্ব সর্বোত্তম। এ তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এ তত্ত্বের উন্নয়নে Joan

Wood Word, Fred Fiedler, Burns and Stalker, Herche Blunchard Model, Lawrence and Lorseh প্রমুখ ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। নিম্নে এ তত্ত্বের উন্নয়নের ইতিহাস আলোচনা করা হলো:

১. জোয়ান উডওয়ার্ড (Joan Wood Word): সাপেক্ষতা মতবাদের উন্নয়নে জোয়ান উডওয়ার্ড গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ১৯৬০ সালে প্রথমদিকে জোয়ান উডওয়ার্ড দক্ষিণ ইংল্যান্ডের প্রায় একশত উৎপাদনকারী ফার্মের গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মে নেতৃত্ব দেন। এ গবেষণা দল ঐ সংগঠনের উৎপাদনশীলতা, কার্যসম্পাদনের প্রক্রিয়া, অর্থায়নের উৎস, সংগঠনের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে। তিনি তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখলেন এ দুটি উপাদানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। এজন্য তিনি সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে এরূপ পার্থক্য খোঁজার চেষ্টা করেন। গবেষণা শেষে তিনি সংগঠনগুলোকে কারিগরি ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগের উপর জোর দেন। জোয়ান উডওয়ার্ড উদ্ভাবিত প্রযুক্তিটি তিনটি মৌলিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যা নিম্নরূপ:

ক. একক ব্যাচ পদ্ধতি: যদি ক্রেতার ফরমায়েশ অনুযায়ী সংগঠনে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও সরবরাহ করে সেগুলো তিনি এ শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করেন। যেমন: দর্জির দোকান বা ছাপাখানা।

খ. অধিক উৎপাদন প্রযুক্তি: ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন যন্ত্রাংশ একত্রীকরণের মাধ্যমে যেসব সংগঠন বড় ধরনের পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে তাদেরকে তিনি এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমন: মটর গাড়ি নির্মাণ শিল্প।

গ. ধারাবাহিক প্রক্রিয়া প্রযুক্তি: একটি দ্রব্য উৎপাদনে যেখানে ধারাবাহিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় তাদের তিনি এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমন: তেল শোধনাগার রাসায়নিক কারখানা।

২. ফ্রেড ফিডলার: ফ্রেড ফিডলারের নেতৃত্বে সাপেক্ষ তত্ত্বের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ তত্ত্বের তিনটি চলক বা বিষয় বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। যেমন: নেতাকর্মীর সম্পর্ক, কার্য কাঠামো এবং সম্পৃক্ত ক্ষমতা। ফিডলার এর মতে, এ তিনটি পরিস্থিতি জ্ঞাত বিষয়ের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩. বার্নস এবং স্টলকার (Burns and Stalker): বার্নস ও স্টলকার পরিচালিত গবেষণার ভিত্তিতে শিল্প সংগঠনের ব্যবস্থাপনা কার্যসম্পাদনের জন্য একটি প্যাটার্ন বা কাঠামো উদ্ভাবন করেন। সংগঠনের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি দুধরনের কাঠামোর কথা উল্লেখ করেছেন যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ক. Adaptive Organic কাঠামো: এ কাঠামো অধিকতর নমনীয় ও নির্ভরশীল যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ব্যবহার করে সুফল পাওয়া যায়।

খ. Stable Mechanistic কাঠামো: যান্ত্রিক কাঠামো অনমনীয় কাঠামো। এ কাঠামোটি সাধারণ পরিবেশ ব্যবহার করে সুফল অর্জন করা যায়।

৪. হারসে-ব্ল্যাঞ্চার্ড মডেল: হারসে ও ব্ল্যাঞ্চার্ডের নেতৃত্বে সাপেক্ষ তত্ত্বের উন্নয়ন ঘটে। এ ধরনকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। তারা দুটি নেতৃত্বের মডেল উদ্ভাবন করেছেন। ত্রিমুখী নেতার কার্যকারিতা মডেল এবং পরিস্থিতিভিত্তিক নেতৃত্ব মডেল। তাদের মতে, নেতৃত্বের কার্যকারিতা ফলপ্রসূতা তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল যেমন: নেতা, অনুসারী এবং পরিস্থিতি সম্বন্ধীয় অবস্থাবলি। নেতা হিসাবে সফলতা অর্জনের জন্য অবশ্যই আচরণগত ও পরিবেশ সম্পর্কিত চলকের উপর গুরুত্বারোপ করা আবশ্যক।

৫. লরেন্স এবং লর্চ (Lawrance and Lorasch): লরেন্স এবং লর্চ তাদের Studies in Organization গ্রন্থে সংগঠনের কার্যাবলির উপর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশের প্রভাবের উপর গতি আরোপ করেছেন। তারা মনে করেন, উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সংগঠনের অভ্যন্তরীণ শক্তি ও দুর্বলতা এবং বাহ্যিক সুযোগ-সুবিধা ও হুমকি মূল্যায়ন করে উদ্দেশ্য অর্জনের পথে অগ্রসর হওয়া উচিত।

উপর্যুক্ত ব্যক্তিরা ছাড়াও সাপেক্ষ মতবাদ উন্নয়নে আরও অনেক ব্যক্তিবর্গ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এফ. ডব্লিউ. ফ্লাই, রামাধার সিংহ প্রমুখ।

পরিস্থিতিভিত্তিক তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য

Characterstics of Contingency Theory

পরিস্থিতির উপর ব্যবস্থাপনার স্বরূপ নির্ভরশীল বলে অন্যান্য মতবাদ হতে এ তত্ত্বে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বা অনুমিত শর্ত রয়েছে। নিম্নে এ তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো:

১. **স্বাধীন চলক (Independent Variable):** এ তত্ত্বের মতবাদ অনুযায়ী পরিবেশগত উপাদানগুলো স্বাধীন চলক যা সংগঠন নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ।

২. **কার্যসম্পাদন (Work Solve):** ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, প্রেষণা, নেতৃত্বদান, সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যসম্পাদনের জন্য এ মতবাদের সর্বোত্তম কোনো পন্থা নাই।

৩. **ধারণা (Concept):** এ মতবাদে সমস্যা সমাধানের চেয়ে ব্যবস্থাপনার অভীষ্ট লক্ষ্য হওয়া উচিত সংগঠনের উদ্দেশ্যের জন্য সম্ভাব্য সব পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকা।

৪. **নির্ভরশীলতা (Dependency):** এ মতবাদ অনুযায়ী সংগঠনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কার্যাবলি ভবিষ্যৎ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

৫. **দাবি পূরণ (Solved Demand):** এ মতবাদে সংগঠনের কার্যাবলির উপর বাহ্যিক পরিবেশ ও প্রযুক্তিগতবিদ্যা ব্যাপক প্রভাব বিস্তারের দাবিদার।

৬. **কাঠামো পরিবর্তন (Changing Sturcture):** এ মতবাদ অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে সাংগঠনিক কাঠামো আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এতে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয় না।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনার পরিস্থিতি মতবাদ বা স্কুলের আলোচিত বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয় যে, সকল সমস্যার সমাধান অনেকাংশে পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল।

পরিস্থিতি নির্ভর তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা

Limitations of Contingency Theory

সাপেক্ষ তত্ত্ব ব্যবস্থাপনা বিশারদ, গবেষক এবং পরামর্শদাতাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উৎপত্তি লাভ করেছে। সংগঠনের অন্যান্য তত্ত্ব হতে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকায় এ মতবাদে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এ তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করা হলো:

১. **সর্বজনীনতা (Universal):** এ তত্ত্বে সর্বজনীন নীতির পরিবর্তনের কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে তেমন কোনো সুস্পষ্ট ধারণা বিবেচনা করা হয়নি। প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বিভিন্ন দলের সামাজিক অন্ত:ক্রিয়া সম্পর্কে এ তত্ত্বে জ্ঞান ও দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। ফলে এটি সমালোচিত হয়েছে।

২. **পরিকল্পিত পরিবর্তন (Planning Change):** এ তত্ত্বে পরিকল্পিত পরিবর্তনের ফলাফল গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়নি। প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের বিভিন্ন দলের সামাজিক আন্ত:ক্রিয়া সম্পর্কে এ তত্ত্বে কোনো দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। এর ফলে সংগঠনের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

৩. **সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন (Change of Organization Structure):** সাপেক্ষ তত্ত্ব অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন সম্ভব নয়। এতে সংগঠনের উদ্দেশ্যার্জন ব্যাহত হয়। কারণ, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংগঠনের কাঠামো পরিবর্তন করতে হয়।

৪. **স্বাধীন চলক (Independent Variable):** এ তত্ত্বে পরিবেশগত উপাদানগুলোকে স্বাধীন চলক হিসাবে গণ্য করা হয়। উক্ত স্বাধীন চলকগুলো সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তবে কোনো সংগঠন তার পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

৫. **সাব-সিস্টেম ধারণা (Concept of Sub-system)**: এ তত্ত্বে স্থায়ী যান্ত্রিক সাংগঠনিক সিস্টেমের বিভিন্ন উপ-সিস্টেমের মধ্যকার সম্পর্ক এবং উন্মুক্ত গ্রহণযোগ্য সাংগঠনিক সিস্টেমের বিভিন্ন উপ-সিস্টেমের মধ্যকার সম্পর্ক বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে যা গবেষণায় প্রমাণিত হয়নি। ফলে এ তত্ত্ব সমালোচিত হয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, পরিস্থিতি প্রেক্ষিত বা ঘটনা নির্ভর তত্ত্বে উল্লিখিত সীমাবদ্ধতাগুলো রয়েছে। এ তত্ত্ব এখন পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়নি। তবে ধারাবাহিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পরিশোধন ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে পারলে এটি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব জঙ্গল

The Management Theory Jungle

সেই প্রাচীন কাল থেকেই সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, বহুচিন্তাবিদ, পণ্ডিতও গবেষক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে মূল্যবান অবদান রাখেন। তারা বিভিন্ন সময়ে ব্যবস্থাপনার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ করেছেন। এসকল মনীষীরা ব্যবস্থাপনার ধারণা, অধ্যয়ন, পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কলাকৌশল ও ব্যবস্থাপনার পেশাদার প্রয়োগের চিন্তাভাবনা করেন এবং বিভিন্ন ধারণা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। তাই সংগঠনগুলোতে বিভিন্ন মনীষীদের চিন্তাভাবনা দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যবস্থাপনা অ্যাপ্রোচ এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে ব্যবস্থাপনা মতবাদের মনীষীদের এ সকল ধ্যানধারণা, কৌশল ব্যবস্থাপনা মতবাদ বা স্কুল হিসাবে পরিচিতি লাভ করে এবং এর ফলে একই বিষয়ে একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। এতে ব্যবস্থাপনা অধ্যয়ন ও প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। অধিকন্তু মনীষীদের এই সকল দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদ প্রয়োগ করে সর্বক্ষেত্রে সমান ফলাফল পাওয়া যায় না। তাই ব্যবস্থাপনার তত্ত্বগত সমস্যা অনুধাবন করে সম্মিলিত ধারণাগুলোকে ব্যবস্থাপনা বিশারদ Harold Koontz ব্যবস্থাপনার এই তত্ত্ব জটিলতাকে ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব জঙ্গল নামে অভিহিত করেছেন।

ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব জঙ্গল সৃষ্টির কারণসমূহ

Causes of Creating Management Theory Jungle

ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব জঙ্গল হলো ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিভিন্ন মনীষীর দেওয়া ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব বা মতবাদের সমাহার। প্রত্যেক বিশেষজ্ঞই নিজের মতামতকে যুক্তিসহ উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোনো মতবাদই সর্ব পরিস্থিতিতে একই ফলাফল প্রদান করে না। ফলে একই বিষয়ে একাধিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে হ্যারল্ড কুঞ্জ ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব জঙ্গল সৃষ্টির ৫টি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. **শব্দ ও অর্থগতসংক্রান্ত জঙ্গল (The Semantics Jungle)**: ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত শব্দের অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- 'ব্যবস্থাপনা' শব্দটিকে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ ব্যবস্থাপনাকে কাজ আদায়ের কৌশল মনে করেন। আবার অনেকে বলেন, 'ব্যবস্থাপনা আর কিছু নয় বরং একটি সামাজিক প্রক্রিয়া মাত্র। এসব দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে দেখা যায় বিভিন্ন জনের দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এভাবে সৃষ্টি হয়েছে ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব জঙ্গলের।

২. **পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান হিসাবে ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞায় পার্থক্য (Difference in Definition of Managment as a Body of Knowledge)**: ব্যবস্থাপনা সরাসরি বিজ্ঞান না হওয়ায় এর কোনো আদর্শ সংজ্ঞা তৈরি হয়নি। আর ব্যবস্থাপনার কোনো আদর্শ সংজ্ঞা না থাকায় সবাই শুধু এটিকে কাজ আদায়ের কৌশল মনে করেন। কিন্তু বাস্তবে ব্যবস্থাপনা শব্দের সাথে আরও অনেক বিষয় জড়িত। কিন্তু তা স্পষ্ট করা হয়নি। এ কারণে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে।

৩. **নীতিমালার ভুল বোঝাবুঝি (The Misunderstanding of the Principles)**: ব্যবস্থাপনার সনাতন চিন্তাবিদদের যে নীতিমালা রয়েছে তা নতুন চিন্তাবিদরা কিছু কিছু প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা ব্যবস্থাপনার নতুন নীতিমালা প্রণয়ের চেষ্টা করেছেন। ব্যবস্থাপনার নতুন চিন্তাবিদদের নীতিমালার পুরোনোদের সাথে কিছতা পার্থক্য থাকলেও তা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং ভুল বোঝাবুঝির কারণেই ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ সংহতিপূর্ণ হতে পারেনি।

৪. **ব্যবস্থাপনা তাত্ত্বিকদের একে অন্যকে বোঝার অক্ষমতা বা অনীহা (Inablility of the Management Theorists to Understand Each Other)**: যেহেতু ব্যবস্থাপনা কোনো প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান নয় এবং এটি অনেকাংশে আচরণিক

বিজ্ঞান। তাই মানুষের আচরণের ভিন্নতার কারণ বুঝতে পারা বা বুঝতে না চাওয়ার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা জঙ্গলের তত্ত্বের মনীষীগণ একে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারবেন না, এটা ঠিক নয়। আসলে বুঝতে না চাওয়াটাই এক্ষেত্রে প্রধান বিষয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, ব্যবস্থাপনা বিশারদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। এতে ব্যবস্থাপনার তত্ত্বগুলো স্পষ্ট না হয়ে জটিল হয়েছে। এভাবেই ব্যবস্থাপনা তত্ত্বগুলো জঙ্গল সৃষ্টি করেছে।

ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব জঙ্গলের অপসারণের উপায়

Ways to Disentangle the Jungle/Remove the Jungle

ব্যবস্থাপনা উন্নয়য়নের পথে অন্যতম বাধা হলো তত্ত্ব জঙ্গল। বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব উদ্ভাবনের কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। এমতাবস্থায় ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের জঙ্গল অপসারণে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। অধ্যাপক হ্যারল্ড কুঞ্জ যে সকল সুপারিশ করেছেন তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

১. **পূর্ণাঙ্গজ্ঞান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন (Need for Definition as Body of Knowledge):** ব্যবস্থাপনা বিশারদগণ ব্যবস্থাপনাকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে সংজ্ঞায়িত করেছেন, এ ছাড়া ব্যবস্থাপনার বিশারদগণ বিভিন্ন শব্দ বা পদ ব্যবহার করেছেন যা মানুষের মনে দ্বিধা সৃষ্টি করেছে, এতে শব্দগত জঙ্গল বা (Semantics) সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো অপসারিত করতে হবে। সকলের জন্য সহজ হয় এমন সংজ্ঞা প্রদান করতে হবে। সুতরাং এ ব্যাপারে গবেষণার প্রয়োজন।

২. **ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য জ্ঞানের একত্রীকরণ (Integration of Management and Other Discipline):**জ্ঞানের একটি নির্দিষ্ট শাখা হিসাবে ব্যবস্থাপনাকে চিহ্নিত করার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে হবে। এতে ব্যবস্থাপনার সাথে অন্যান্য বিষয় সমন্বয় করে ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব জঙ্গল অপসারণ করা প্রয়োজন। অর্থাৎ, যদি উপযুক্ত হিসাবে ব্যবস্থাপনাকে চিহ্নিত করা যায় তাহলে এই সমস্যা দূর হবে।

৩. **ব্যবস্থাপনা পদসমূহের ব্যাখ্যা দান (Classification of Management Semiotics):** ব্যবস্থাপনার প্রত্যেকটি পদ বা মতামতে একটি সর্বজনীন (Universal) এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ (Uniform) ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন, যেন সকলেই একটি পদকে একই রকমভাবে বুঝতে সক্ষম হয়। এর কাজের জন্য কোনো কমিশন গঠন করা যেতে পারে। এরূপ কমিশনের পক্ষে পদের ব্যাখ্যা দান করা সহজ হবে। ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত প্রত্যেকটি পদের সঠিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

৪. **মৌলিক বিষয়সমূহ পরিশোধন ও পরীক্ষা (To Distill and Test Fundamentals):** প্রত্যেকটি মৌলিক বিষয় অবশ্যই পরীক্ষণের মাধ্যমে বাছাই করে এটির গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। ব্যবস্থাপনা আচরণ বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়। তাই বিজ্ঞানের মতো এর বৈধতা সর্বজনীনভাবে সম্ভব নয়, কিন্তু এ সমস্যা অনেকাংশেই লাঘব করা সম্ভব। প্রতিটি বিজ্ঞানই পর্যাপ্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তাদের নীতিসমূহের বৈধতা যাচাই করে থাকে। সে হিসাবে ব্যবস্থাপনাার নীতিসমূহেরও বিশ্লেষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং অধিক কাম্য।

৫. **পারস্পরিক বোঝাপড়া/ঐক্য (Mutual Understanding of Each Others):** পুরাতন পদবির সাথে নতুন পদবির ব্যবহার ও মতামত উপস্থাপন করা হয়। পারস্পরিক বোঝাপড়াও ঐক্যের অভাবে এটি সাংঘর্ষিক রূপ ধারণ করে। এ অবস্থায় পর্যাপ্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যম বিষয়গুলোর বৈধতা যাচাইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে ব্যবস্থাপনাকে পূর্ণাঙ্গভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। তবেই ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব জঙ্গল সমস্যা দূর হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ সাপেক্ষ তত্ত্ব সম্পর্কে খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ

পরিস্থিতি বা বিকল্প বলতে বুঝায় প্রয়োজনানুযায়ী বিকল্প কার্যসমূহ গ্রহণ করা। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিস্থিতিমূলক বা বিকল্প এর অর্থ হলো সকল পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য কোনো একক পদ্ধতিই ফলপ্রসূ নয় এবং ব্যবস্থাপকগণ এ ক্ষেত্রে কার্যসম্পাদনে যে-কোনো পন্থা ব্যবহারের জন্য স্বাধীন হন। এ মতবাদ অনুসারে ব্যবস্থাপনায় গতানুগতিক নীতি প্রয়োগ থেকে আধুনিক ধারায় পরিস্থিতি মোকাবিলায় তা অপর্যাপ্ত বলে মনে করেন। পরিস্থিতি অ্যাপ্রোচ প্রবর্তনকারীদের মূল ধারণা হলো প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তির প্রকৃতি, প্রতিষ্ঠানের আকার, আইনগত ব্যবস্থা, বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য উপাদান যা প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিতে অসুবিধার সৃষ্টি করে, এগুলোকে সাংগঠনিক কাঠামোর সাথে সংগতিবিধান করতে হবে। পরিস্থিতির উপর ব্যবস্থাপনার স্বরূপ নির্ভরশীল বলে অন্যান্য মতবাদ হতে এ তত্ত্বে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বা অনুমিত শর্ত রয়েছে। যেমন: ১. স্বাধীন চলক ২. কার্যসম্পাদন ৩. ধারণা ৪. নির্ভরশীলতা ৫. দাবি পূরণ ৬. কাঠামো পরিবর্তন। সেই প্রাচীন কাল থেকেই, সমাজ বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ বহুচিন্তাবিদ, পন্ডিত গবেষক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে মূল্যবান অবদান রাখেন। তারা বিভিন্ন সময়ে ব্যবস্থাপনার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ করেছেন। এসকল মনীষীরা ব্যবস্থাপনার ধারণা, অধ্যয়ন, পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কলাকৌশল ও ব্যবস্থাপনার পেশাদার প্রয়োগের চিন্তা ভাবনা করেন এবং বিভিন্ন ধারণা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। তাই সংগঠন গুলোতে বিভিন্ন মনীষীদের চিন্তাভাবনা দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যবস্থাপনা অ্যাপ্রোচ এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে ব্যবস্থাপনা মতবাদের মনীষীদের এ সকল ধ্যানধারণা, কৌশল, ব্যবস্থাপনা মতবাদ বা স্কুল হিসাবে পরিচিতি লাভ করে এবং এর ফলে একই বিষয়ে একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। এতে ব্যবস্থাপনা অধ্যয়ন ও প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বেন সৃষ্টি হয়। অধিকন্তু মনীষীদের এই সকল দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদ প্রয়োগ করে সর্বক্ষেত্রে সমান ফলাফল পাওয়া যায় না। তাই ব্যবস্থাপনার তত্ত্বগত সমস্যা অনুধাবন করে সম্মিলিত ধারণাগুলোকে ব্যবস্থাপনা বিশারদ Harold Koontz ব্যবস্থাপনার এই তত্ত্ব জটিলতাকে ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব জঙ্গল নামে অভিহিত করেছেন।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১. আধুনকি মতবাদ বলতে কী বুঝায়? এর বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন।
২. আধুনিক মতবাদের উপাদান বা বিভিন্ন দিক আলোচনা করুন।
৩. নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য তত্ত্ব আলোচনা করুন।
৪. উৎকর্ষ আরোপ মতবাদ কী? বর্ণনা করুন।
৫. সামাজিক অবস্থা মতবাদ কী? বর্ণনা করুন।
৬. অভিজ্ঞতাভিত্তিক মতবাদ কী?
৭. ব্যবস্থাপনা ভূমিকা মতবাদ বর্ণনা করুন।
৮. সিদ্ধান্ত মতবাদ ও পুন: প্রকৌশলকরণ মতবাদ কাকে বলে?
৯. সংখ্যাত্মক মতবাদের সংজ্ঞা দিন। এ মতবাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
১০. সংখ্যাত্মক তত্ত্বের দুর্বলতাগুলো কী?
১১. সংখ্যাত্মক তত্ত্বের মাধ্যমে কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়?
১২. সিস্টেম মতবাদ কাকে বলে? এ মতবাদের মৌলিক ধারাগুলো কী?
১৩. সিস্টেম মতবাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
১৪. সিস্টেম মতবাদের উপ-সিস্টেমসমূহ আলোচনা করুন।
১৫. সিস্টেম ও উপ-সিস্টেমে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ কী?
১৬. সিস্টেমের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
১৭. সিস্টেম তত্ত্বের ভালো ও দুর্বল দিকগুলো আলোচনা করুন।
১৮. নেতৃত্বের আচরণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।
১৯. লাইকোর্টের ব্যবস্থাপনার চার সিস্টেম কী?
২০. ব্যবস্থাপনা গ্রিড কী? চিত্রসহকারে ব্যবস্থাপনা গ্রিড ব্যাখ্যা করুন।
২১. নেতৃত্বের লক্ষ্যপথ তত্ত্ব? ব্যাখ্যা করুন।
২২. হারসে-ব্রেনচার্ড এর পরিস্থিতি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।
২৩. সাপেক্ষ বা পরিস্থিতি বা বিকল্প মতবাদ বলতে কী বুঝায়?
২৪. ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব জঙ্গল - ব্যাখ্যা করুন।

সহায়ক গ্রন্থ :

- Kathryn M. Bartol & David C. Martin, “Management”, 2nd Edition, McGraw-Hill, INC, Newyork, 1994.
- Ricky W. Griffin, “Management” , (12th ed), AITBS publication, New Delhi.
- HeinZ Weihrich & Harold Koontz, “Management”, 10th Edition, McGraw-Hill, INC, USA, 1994.